সংবাদ

৭৬ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে

বিশেষ ই-ম্যাগাজিন

৭৬ বছর

/thedailysangbad

/@sangbadview

সংবাদ

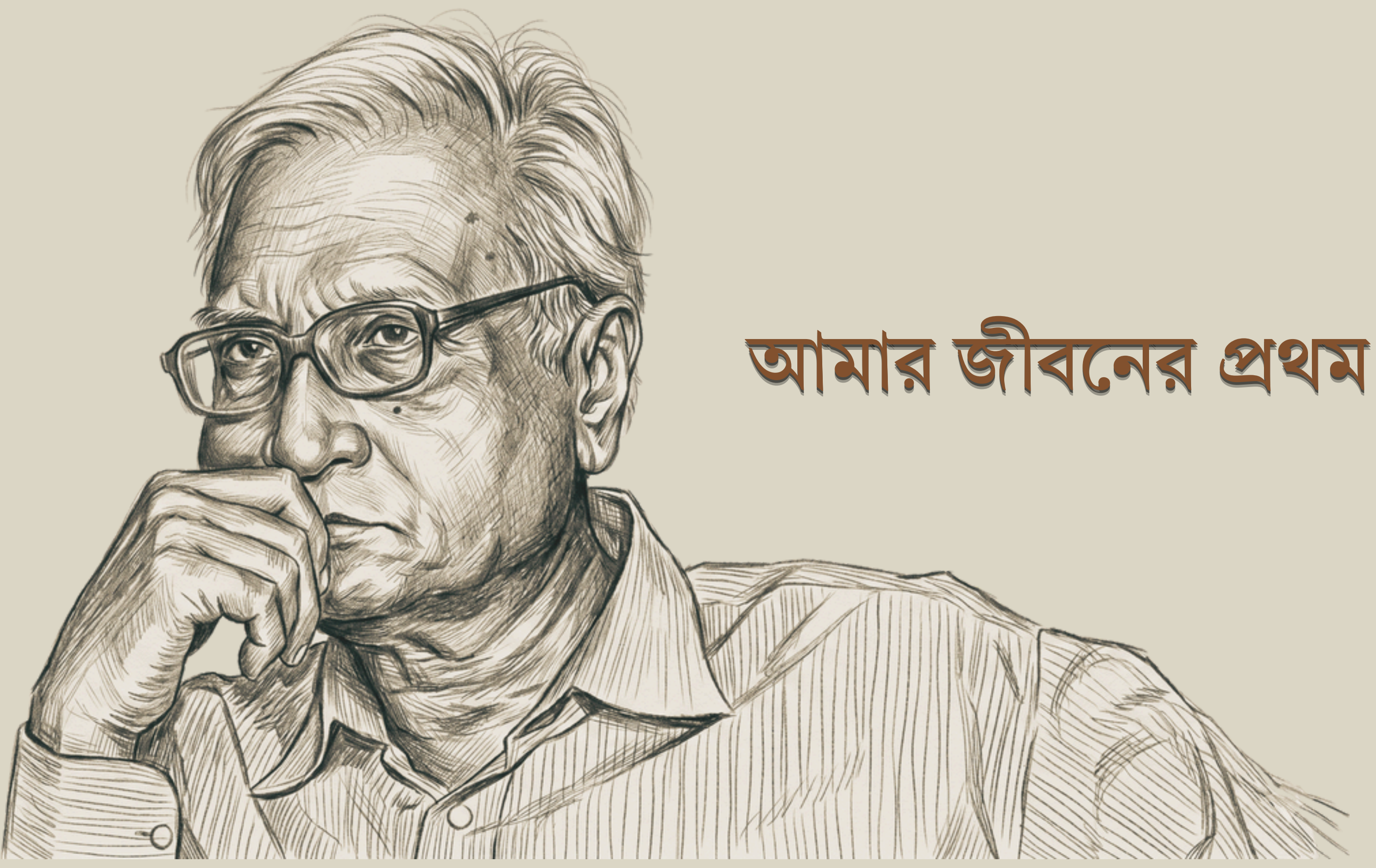

আমার জীবনের প্রথম উপার্জন সংবাদ থেকে

দৈনিক সংবাদ ৭৬ বছরে পদার্পণ করছে, এটা অত্যন্ত ভালো একটি ঘটনা। ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকাটি রয়ে গেছে এবং এটা কখনো থেমে যায়নি। শুরুর কয়েক বছরের মধ্যে এর মালিকানা বদল হয়েছে। সংবাদ যখন প্রথম প্রকাশিত হলো তখন একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। আমি তখন স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছি। তো তখন চাঞ্চল্যটা এইরকম যে, সংবাদ বাংলা নামে একটা পত্রিকা বের হলো। আর তখন ‘আজাদ’, ‘জিন্দেগী’ এইরকম পত্রিকার নাম আর কি, ‘তাজবী’ সাপ্তাহিক পত্রিকা আবার ‘মর্নিং নিউজ’ ইংরেজি পত্রিকা। বাংলা নামে একটা পত্রিকা বেরলো।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে, এখানে যারা তরুণরা কাজ করতেন আমাদের চেনা, আমাদের বয়সে বড়, তারা সকলেই আধুনিক মানুষ ছিলেন, কিছুটা বামপন্থী ছিলেন। কিন্তু প্রথমে এর বিরুদ্ধে একটা বৈরিতা ছিল। অর্থাৎ পত্রিকাটা নামে প্রগতিশীল, কর্মীরা প্রগতিশীল এবং অনেক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যও। কিন্তু পত্রিকার মালিকানা হচ্ছে মুসলিম লীগের। তো বায়ান্ন সালে সংবাদ আমরা পুড়িয়েছি। এইজন্য যে বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে, বাইশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটা আমাদের মনঃপূত হয়নি। আজিমপুর আমরা থাকতাম ওখানে পত্রিকা বিতরণের একটা জায়গা ছিল, তো ওগুলো পুড়িয়ে দিলাম। আজাদও পোড়ালাম, সংবাদও পোড়ালাম, মর্নিং নিউজও পোড়ালাম।

তো এর পরে যেটা ঘটল সেটা হলো সংবাদের মালিকানা বদল হলো। চুয়ান্ন সালের নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগের পতন হওয়ার কারণে এর মালিকানা বদল হয়ে গেল। তখন সংবাদ একেবারে একটা প্রগতিশীল ধারায় চলে গেল। আমার সাথে সংবাদ-এর যোগাযোগের আরেকটি ক্ষেত্র ছিল যে, সংবাদের খেলাঘর পাতায় আমি লিখতাম। আমি তখন খেলাঘরের সদস্য না কিন্তু খেলাঘরে লিখতাম। ছোটদের জন্য লিখতাম। কিশোর বয়সে সেখানে আমার লেখালেখি শুরু। আমার প্রথম উপার্জন লেখক হিসেবে এই সংবাদ থেকে। আমার মনে আছে ঘটনাটা হচ্ছে, আমরা পাড়ায় আজিমপুর কলোনিতে নানা অনুষ্ঠান করতাম।সেই খবর দিতে গিয়ে সংবাদ অফিসে যাই। হাবিবুর রহমান সাহেব ছিলেন তখন ওই খেলাঘরের পরিচালক ভাইয়া নামে। তো আমি লিখে খবরটা নিয়ে গেছি। ওরা বললো, তুমি নাম লিখে দাও সংবাদদাতা কে? আমি আমার নাম লিখলাম। ওরা বললো, তুমি তো লেখ আমাদের এখানে। আমি বললাম হ্যাঁ আমি লিখি। বললেন, আমরা বিল করি তো তুমি একটা বিল পাওনা আছো। ওইখান থেকে আমি পরে বিল ৫ টাকা সংগ্রহ করেছিলাম। ৫ টাকা তখন অনেক টাকা। আমার এটা প্রথম উপার্জন লেখক হিসেবে সংবাদ থেকেই।

তারপরে আমি সংবাদে নিয়মিত লিখি। সংবাদের আবুল হাসানাতই লেখার প্রস্তাবটা নিয়ে এসেছিলেন। জহুর হোসেন চৌধুরী আগে লিখতেন ‘দরবারে জহুর’। তিনি মারা গেলে তার জায়গায় একটা শূন্যতা তৈরি হলো। সংবাদ কিন্তু তখন কলমের জন্য বেশ পরিচিত ছিল এবং সংবাদের পাঠক নির্দিষ্ট ছিল। তারা ওই কলামগুলো খুব উৎসাহের সঙ্গে পড়তেন। তো জহুর আহমেদ চৌধুরীর কলাম ‘দরবারে জহুর’ আর তখন প্রকাশিত হচ্ছে না তিনি পরলোকগমন করেছেন। তো সেখানে আমাকে বলা হলো, আমি খুব আনন্দের সঙ্গে লিখলাম এবং আমাকে খুব স্বাধীনতা দিয়েছে। অনেক সময় এরকম হয়েছে বজলুর রহমান বলেছেন যে আপনার লেখা আমার মনে হয়েছিল যে আপনার সাথে তর্ক করব কিন্তু তাও আমরা ছেপে দিয়েছি। কেননা তখন সমাজতন্ত্রের পতনের একটা আভাস দেখা যাচ্ছে। আমি কিন্তু সমাজতন্ত্রের পক্ষে লিখছি। তখন অনেকে যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন আগে ক্রুশ্চেভের পরবর্তী কালে তারা ওই জায়গা থেকে সরে এসেছেন। কাজেই একটা মতদ্বৈততা ওখানে দেখা দিত কিন্তু তারা ছাপতেন।

আরেকটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগত যে প্রতিক্রিয়া আসত। প্রত্যেক সপ্তাহে অনেক প্রতিক্রিয়া আসত। সন্তোষ গুপ্ত ছিলেন সহ-সম্পাদক। উনি এগুলো সংগ্রহ করে আবার একজন লোক আসতেন নিয়ে যেতে। আমার লেখাটা ছাপা হত মঙ্গলবারে। উনি নিয়ে যেতেন রোববারে। তো রোববারে অনেকগুলো প্রতিক্রিয়া পেতাম। এই প্রতিক্রিয়াটা এত ভালো লাগত যে, মানুষ পড়ছে, চিন্তা করছে। সংবাদ-এ টানা ২৪ বছর ‘সময় বহিয়া যায়’ শিরোনামে এবং ‘গাছপাথর’ ছদ্ম নামে লিখেছি। ‘সময় বহিয়া যায়’ শিরোনাম দেয়ার মানে হচ্ছে, সময় চলমান, নানা ঘটনা প্রবাহ বিদ্যমান আর গাছ হচ্ছে স্থির, স্থিরভাবে সবকিছু দেখে। তাই গাছপাথর। এখনও আমি লিখি কিন্তু আগের মতো আর প্রতিক্রিয়া পাই না। এখন আমাদের লেখা ছাপা হয় বা লিখি। পত্রিকাও বের করি কিন্তু প্রতিক্রিয়া পাই না। এতোটা বদলে গেছে। মানুষ একেবারেই একাকি হয়ে গেছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বা মানুষ মনে করে যে প্রতিক্রিয়া দিয়ে আর কী লাভ হবে। এর কোনো বদল হবে না। তো আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এই পত্রিকাকে যে, তারা চলেছে এবং ক্রমাগত বিকশিত হয়েছে এবং আরো আরো বিকশিত হোক আরো উন্নত হোক সেই শুভকামনা আমার রইলো।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
শিক্ষাবিদ ও লেখক

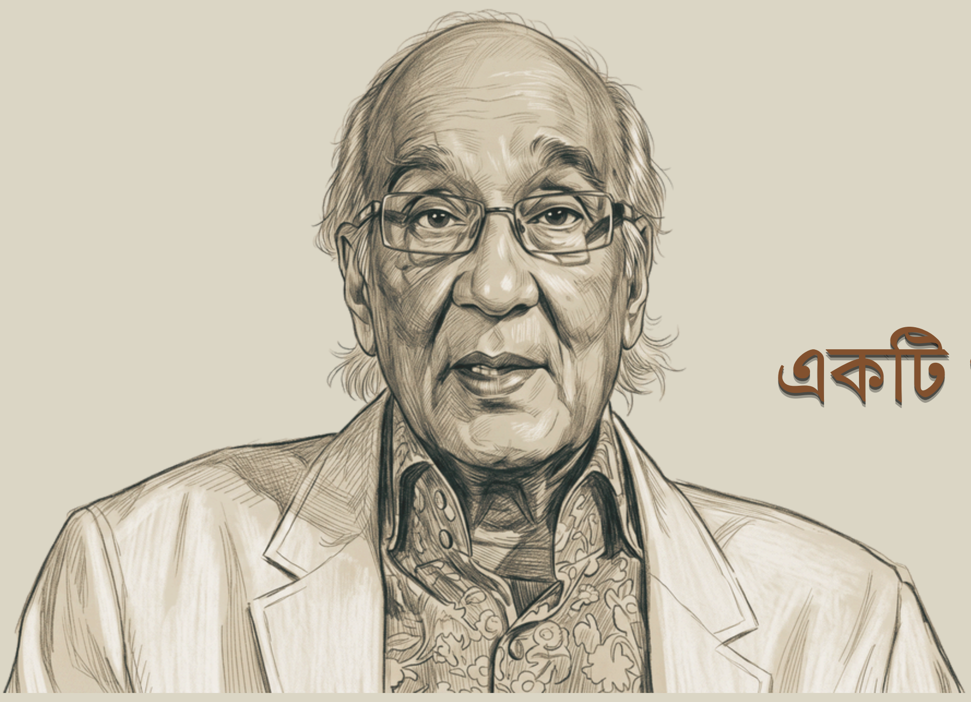

একটি পত্রিকা ৭৫ বছর টিকে থাকা অনেক বড় বিষয়

দৈনিক সংবাদ একটি প্রগতিশীল চিন্তা ও চেতনার কাগজ। সবসময় সাধারণ মানুষের কথা বলে। যেকোনো আন্দোলন সংগ্রামে মানুষের পক্ষে থেকেছে। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে এই সংবাদপত্রটি মুসলিম লীগ ঘরানার ছিলো। পরবর্তীতে পত্রিকাটি আহমদুল কবির কিনে নেন। তিনি নিজে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ধারার লোক ছিলেন। কাগজটিতেও সেই চিন্তার প্রতিফলন ঘটান। বামপন্থী অনেক লেখক এখানে নিয়মিত লিখতেন। আমার বন্ধু সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'গাছপাথর' ছদ্মনামে নিয়মিত লিখেছেন। বোধ করি আমারও দু-একটি লেখা এই পত্রিকাটিতে ছাপা হয়েছিলো। সংবাদ অনেক সাংবাদিক তৈরি করেছে। এই দেশে একটি পত্রিকা দীর্ঘ ৭৫ বছর টিকে থাকা অনেক বড় বিষয়। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মধ্যে দিয়ে এই পত্রিকা আরও দীর্ঘ সময় ধরে থাকুক এবং এর সমৃদ্ধি কামনা করি। প্রতিষ্ঠানটির সংবাদকর্মীদের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই।

শফিক রেহমান
সম্পাদক, যায়যায় দিন

সংবাদের মতো পত্রিকা এখন খুব দরকার

দৈনিক সংবাদ তো বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত একটি পত্রিকা এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সাংবাদিক লেখক তাদেরও বড় ভূমিকা ছিল ইতিহাসে। আমি নিজে আমার স্কুল জীবনে কিছু ছোটদের পাতায় লেখা তারপর বড় হয়ে অন্যান্য লেখা সংবাদে বিভিন্ন সময় প্রকাশ করেছি। আর সংবাদের ভূমিকাটা ছিল খুবই ধারাবাহিক একটা ভূমিকা ছিল সবসময় একটা অসাম্প্রদায়িক এবং গণতান্ত্রিক বামপন্থী ঘরানার যারা তারা এটাকে, সংবাদ পত্রিকাকে তাদের কাছের বলে সবসময় মনে করত।

ওই সংবাদটা অনেকদিন থেকেই আসলে এই পত্রিকার খুব একটা আমরা খোঁজখবর পাচ্ছি তা না। তো আমরা এটা এখন আশা করি যে এ ধরনের সংবাদ মাধ্যমের তো দরকার খুব। আমি প্রতিবন্ধকতা আছে জানি প্রতিকূলতা নানা রকম আছে কিন্তু তার মধ্যেও সংবাদ নতুন কালে নতুন প্রযুক্তিতে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুনভাবে এটা ফিরে আসবে এবং আরো বিকশিত হবে জনগণের কাছে যাবে এবং সংবাদ একটা শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে দাঁড়াবে এই প্রত্যাশা রাখি এবং আমার শুভেচ্ছা জানাই।

আনু মুহাম্মদ
অর্থনীতিবিদ ও মানবাধিকারী কর্মী

সংবাদের কলামগুলো বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়তাম

এটা খুব আনন্দের খবর যে সংবাদ ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পার করে ৭৬তম বৎসরে পদার্পণ করছে। সংবাদের এই ৭৫ বছরের জার্নি বা চলমান ইতিহাস সেটা খুবই উজ্জ্বল, খুবই বর্ণাঢ্য, খুবই হৃদয়গ্রাহী এবং আমার কাছে বিশেষভাবে হৃদয়গ্রাহী। কারণ সংবাদ ছিল সব সময় প্রগতিশীলদের এক মহৎ সমাবেশ। সংবাদ প্রতিষ্ঠাই করেছিলেন তার মালিক ব্যবসায়ী আহমদুল কবির, কিন্তু তিনি আসলে ছিলেন ন্যাপের একজন প্রগতিশীল নেতা। এছাড়াও এখানে সাংবাদিকতা করেছেন শহীদুল্লাহ কায়সার যিনি ছিলেন গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য যদিও মুক্তিযুদ্ধে তাকে করুণভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, শহীদ হতে হয়েছে। তারপরে সেখানে হাল ধরেছে সন্তোষ গুপ্ত। তারপরে সেখানে আমরা দেখেছি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে বজলুর রহমানকে যিনি এক সময় 'একতা' পত্রিকা চালাতেন।

সংবাদের এই চলমান ইতিহাসে তার যে শ্রেষ্ঠ একটা জায়গা ছিল খেলাঘর। সংবাদ খেলাঘরের যে আন্দোলন সেটাতেও অবদান রেখেছে। সাহিত্য সাময়িকীটা সংবাদের বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে আবুল হাসনাতের নেতৃত্বে সেখানে খুব বড় বড় লেখকেরা লিখতেন। আমি তো এক সময় খুব গভীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকতাম সৈয়দ শামসুল হকের 'হৃদকলমের টানে' কলামের জন্য। এছাড়াও শামসুর রাহমানের কবিতা বের হতো। আর শেষ দিকে এমনকি ৮০-এর দশকের দিকেও সেখানে তীক্ষ্ণ সাহসী কলাম লিখে গেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'গাছপাথর' নাম দিয়ে এবং সেটা খুবই জনপ্রিয় ছিল। সব মিলিয়ে সংবাদের এই ইতিহাস কখনোই কেউ ভুলবে না এবং আমরা আশা করবো সংবাদ তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করে আরো সামনে আরো বড় গৌরবের অধিকারী হবে।

এম এম আকাশ
অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ

সংবাদ

প্রগতিপন্থি পত্রিকা বলতে সংবাদকেই চিনি

প্রথমেই যেটা বলতে চাই, সেটা হলো আমাদের বাড়িতে আমার বাবা-মা সংবাদের পাঠক ছিলেন। আমাদের বাড়িতে কম হলেও ৪০ বা ৪৫ বছর সংবাদ রাখা হতো। তার পেছনেও কয়েকটা কারণ আছে। একটা তো একেবারেই পারিবারিক। ব্যক্তিগত কারণ হলো যে, সংবাদের তৎকালীন সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী আমার বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। উনাদের মধ্যে খুব আসা যাওয়া ছিল সেটা একটা কারণ। আর হলো তখনকার দিনে কিন্তু প্রগতিপন্থী পত্রিকা বলতে আমরা সংবাদকেই চিনতাম, সংবাদকেই বুঝতাম, সেটা আরেকটা কারণ যে সংবাদ রাখা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে যেটা হলো মানে অনেকগুলো পত্রিকা রাখার সামর্থ্য কমে যাওয়াতে সংবাদটা বাদ পড়ে গেল।

কিন্তু আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই এখানে। আমরা একবার একটা চিত্রপ্রদর্শনীতে গিয়েছিলাম। মানে একজন নামকরা ফটো সাংবাদিকের চিত্র প্রদর্শনীতে। সেখানে একটা ছবি ছিল সাদা কালো, বেগম সুফিয়া কামাল সংবাদ পড়ছেন সংবাদ লেখাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী সেটা সঙ্গে সঙ্গে কিনে নিল। পয়সা আমি দিলাম, তার তো পয়সাকড়ি ছিল না। যাই হোক সেটা কিন্তু তার অফিসে যেখানে বসতেন ঠিক তার মাথার উপরে ওটা ছিল। এবং মানে এতটাই, সে শুধু বেগম সুফিয়া কামালকে সম্মান করত তা না সংবাদ পত্রিকার প্রতি যে তার একটা ভালোবাসা ছিল, মানে একটা বিশেষ স্থান ছিল সেটাও তার একটা প্রতিফলন। সুতরাং সংবাদ পত্রিকার জন্য আমার অনেক অনেক শুভাশীষ এবং আপনাদের সাফল্য কামনা করি। সংবাদ যেন আবার সেই আগের মতো করে পাঠক তৈরি করতে পারে, পাঠক সংগ্রহ করতে পারে, সেটা আশা করি।

শিরীন পারভীন হক
নারী নেত্রী

সংবাদ ও বাংলাদেশ

আহমদুল কবির

[লেখাটি 'সংবাদ'-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র থেকে পুনর্মুদ্রিত]

এই সংখ্যা যেদিন বের হবে, সেদিন 'সংবাদ' ৫০ বছরে পা দিয়ে ফেলেছে। এ দীর্ঘ ৫০ বছরের মধ্যে বছর তিনেক ছাড়া সংবাদ বাংলাদেশের উত্থান ও বাঙালি জাতির সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সুদীর্ঘ ইতিহাস কে লিখবেন, সেটা পরের কথা। আজকের এই নিবেদনে 'সংবাদ'-এর জীবনের কতগুলো ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, যেটা বাংলাদেশের ইতিহাসে অবদান রেখেছে এবং রাজনীতি ও বাঙালি জাতীয়তার সঙ্গে ইন্টারেক্ট করেছে।

যেমন ১৯৫১ সালের ১৭ মে 'সংবাদ' বের হয় মুসলিম লীগের পত্রিকা হিসেবে, যদিও মুসলিম লীগ কাগজটা কিনে নেয় ১৯৫২ সালে। তখন 'সংবাদ'-এর সম্পাদকীয়তে মুসলিম লীগের মতামত প্রাধান্য পেত, তবে খবর পরিবেশন বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাঙালিত্ব 'সংবাদ'-এর নামাবলি ছিল বললেই চলে। খায়রুল কবির (বড় ভাই) এ সম্বন্ধে ছিলেন অনমনীয়।

মুসলিম লীগের ভরাডুবির পর 'সংবাদ'-এর যখন ডুবুডুবু অবস্থা, তখন তার পরিচালকবৃন্দ তথা নাসিরউদ্দিন, জহুর হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দ নুরুদ্দিন ঠিক করলেন, কাগজ চালাবেন। তারা এসে আমাকে বাধ্য করলেন কাগজে সংশ্লিষ্ট হতে। তখন 'সংবাদ'-এর মাইনে ছিল ৬ হাজার টাকা থেকে একটু বেশি। মাসে মাসে ওই টাকা জোগান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের বিদায় করলাম। তারা মিলে আনোয়ার হোসেনের নামে মুসলিম লীগের কাছ থেকে 'সংবাদ' কিনে নিলেন। তারপর মওলানা ভাসানীর আশীর্বাদ নিয়ে 'সংবাদ'-এর নতুন যাত্রা শুরু হয়।

প্রথম থেকেই 'সংবাদ'-এর জন্য কিছু নীতি সুনির্দিষ্ট করা হয়। তার প্রথম হচ্ছে : 'সংবাদ' সম্পূর্ণ দলনিরপেক্ষভাবে চলবে। বিশেষ কারণ ছাড়া এ কাগজের কোনো কর্তাব্যক্তি রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবেন না। যদিও সকলেই জানতাম, 'সংবাদ'-এর কর্তারা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত এবং তাদের সঙ্গে আলাপ করেই কাগজ চলছে। তার দু-একটি উদাহরণ এই নিবন্ধেও 'সংবাদ'-এর প্রথম দিনগুলো ও পরিবর্তনের কাহিনী জহুর হোসেন চৌধুরীর লেখায় আছে (পুনঃমুদ্রিত)। এই লেখায় 'সংবাদ' কিভাবে রাজনীতি এবং বাঙালি জাতীয়তার বিকাশের পথে প্রভাব রেখেছে তার সারসংক্ষেপ আছে।

রাজনীতির দিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা দাঁড়িয়ে গেল যখন কাগমারির সম্মেলন হয়। সৈয়দ নুরুদ্দিন ও জহুর সাহেব কাগমারিতে গেলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির নির্ধারিত নীতি মেনে মওলানা ভাসানীকে দিয়ে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় জোটনিরপেক্ষ নীতি পুনঃগ্রহণ করা হয়েছে বলে ফরমান জারি করান। স্বহস্তে লিখিত সেই ফরমানটি কপার প্লেট করে 'সংবাদ'-এ ছাপা হয়। যদিও কাউন্সিল সভা তখন শুরু হয়নি। ফল হলো আওয়ামী লীগের দ্বিধাবিভক্তি এবং ন্যাপের জন্ম।

তারপর রাজনীতির টানাপড়েনে সোহরাওয়ার্দীর ১৩ মাসের প্রধানমন্ত্রিত্ব খারিজ হলো, ফিরোজ খান নুন এলেন। সামরিক শাসন হবে আন্দাজ করতে পেরে 'সংবাদ' অক্টোবরের ৩ মাস আগেই আওয়ামী লীগের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল। এর ফলে রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন এলো এবং মওলানা ভাসানীর কলাকৌশল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অপপ্রয়োগের ফলে জাতীয় রাজনীতিতে (পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ নয়) আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। আশ্চর্যের বিষয়, তখনকার সময় বাংলাদেশের প্রায় সব নামি-দামি বুদ্ধিজীবী বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; কিন্তু বাংলার গ্রামে-গঞ্জে, পথে-প্রান্তরে তারা বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় দিয়ে গেছেন।

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির পর তারা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলে জহুর সাহেব ও সৈয়দ নুরুদ্দিনকে 'সংবাদ' বন্ধ করে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ ঘটনা ঘটতো, যদি না রণেশ দাশগুপ্তের মতো নমস্য বুদ্ধিজীবী বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে ঘোষণা দিতেন, দু'পৃষ্ঠা হলেও 'সংবাদ' বের হবে। আমি তার সঙ্গে একমত হলাম।

সামরিক শাসন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে জিনিসপত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে যায়। ইমামগঞ্জ, চকবাজারের ব্যবসায়ীরা অভিযুক্ত হওয়ার দায় না নিয়ে সব মালামাল বুড়িগঙ্গায় ডুবিয়ে দিল। তখন 'সংবাদ' পরিষ্কার ভাষায় অভিমত জানায়, বাজার নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে কোনো কাজে আসবে না; বরং ফলাফল হবে জনগণকে আরও উত্তেজিত করা। তার পরের দিন জামালপুরে চালের দাম মণপ্রতি ৪২ টাকায় উঠলো। সামরিক শাসক জেনারেল ওমরাও খাঁ কৈফিয়ৎ চাওয়াতে আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলতে বাধ্য হয়েছি, ঘটনা সত্যি। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সাত কলাম হেডলাইন দিয়ে খবরটি পরিবেশন করেছিলাম। ব্যবস্থা হলো, সরকার এক রেক চাল চাল জামালপুরে পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চালের দাম পড়ে গেল। আমরা সে খবরও ছাপলাম। কেউ বলল, আমরা সামরিক শাসকের সঙ্গে সহযোগিতা করছি। আবার কেউ বলল, এছাড়া চালের দাম কমানোর আর কোনো পথ ছিল না।

তেমনি 'সংবাদ'-এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার বিরুদ্ধে। ১২ জানুয়ারি রাতে করাচি থেকে রওনা দিয়ে ১৩ জানুয়ারি সকালে আমি ঢাকা ফিরে আসি। তখন ঢাকায় আগুন জ্বলছিল। সন্ধ্যায় বের হয়ে টায়ার পোড়া আগুনের ভেতর দিয়ে নবাবপুর রোড ধরে 'সংবাদ' অফিসে গেলাম। তার মধ্যেও দেখি 'সংবাদ'-এ সবাই হাজির। রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, অজিত গুহসহ ৩/৪ জনকে আমার বাসায় নিয়ে এলাম।

বাসায় ফিরেই খবর পেলাম, দাঙ্গাকারীরা আমার নিজ গ্রাম ঘোড়াশালে আগুন দিয়েছে। তখনকার পাকিস্তান জুটমিলে দাঙ্গাকারীরা আগুন দেয়। পাশের জেলেপাড়ার দু'টি শিশু আগুনে পুড়ে মারা যায়। এদিকে ঢাকায় আমার ব্যবসায়িক অফিসে গঠিত হয় সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বদলীয় শান্তি কমিটি। সে কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তার সঙ্গে ছিলেন জহুর হোসেন চৌধুরী, শহীদ সাঈদুল হাসান, শহীদ শহীদুল্লা কায়সার, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আবদুস সালাম, শহীদ সিরাজ উদ্দিন হোসেন প্রমুখ। সংবাদ, ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন কাগজে অভিন্ন সম্পাদকীয় এবং 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে প্রধান খবর প্রকাশিত হয়। এর ফলে দাঙ্গা বন্ধ হয়ে যায়। মজার ঘটনা হলো: সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী শান্তি কমিটির প্রচারপত্র মিরপুরে তদানীন্তন গভর্নর মোনায়েম খানের গাড়িতে ছুড়ে মারার অভিযোগে সব নেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। আমার ব্যবসায়িক পার্টনার সাঈদুল হাসানকে আসামি করা হয়। আর আমি ঢাকা না থাকা সত্ত্বেও আমাকে করা হয় সাক্ষী।

ঘটনাটা মুখরোচক বলে এখানে উল্লেখ করছি। সাক্ষী দিতে কোর্টে গিয়ে দেখি আসামিরা সব হাজির। কি কি ব্যাপারে সাক্ষ্য হবে কোর্ট দারোগা আমাকে শেখালেন। তথাস্তু বলে আমি উকিল বারের দিকে রওনা দিলাম। আতাউর রহমান খান তখন বারের প্রেসিডেন্ট। আমার ওপর কোর্ট দারোগার সন্দেহ হওয়ায় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি সাক্ষ্য দেব? আমি জবাবে বললাম, কোর্ট দারোগা আমাকে এসব কথা বলতে বলেছেন। এ অবস্থায় ডিএসপি আমাকে কোর্টে নিয়ে গিয়ে বারী ঘোষণা করার অনুমতি চাইলেন। মামলার সেখানেই শেষ।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় 'সংবাদ' যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে তা ইতিহাসে লেখা থাকবে। 'সংবাদ' বাঙালি জাতীয়তার মুখপাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন দৈনিক ইত্তেফাক বন্ধ ছিল। জন্মলগ্নে 'সংবাদ' বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বামপন্থী কর্মকর্তা থাকা সত্ত্বেও 'সংবাদ' বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হয়নি। ১৯৬৭ সালে এর প্রতিফলন ঘটে ৬ দফা ও ১১ দফার আন্দোলনে 'সংবাদ'-এর বিশিষ্ট ভূমিকার কথা সবারই মনে থাকার কথা। ১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ে খবর 'সংবাদ' যেভাবে তুলে ধরেছে, তেমনি গুরুত্ব সহকারে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহতদের খবর ছাপতেও 'সংবাদ' পিছপা হয়নি। আন্দোলন যখন তুঙ্গে ওঠে, সেই ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর ৮ মার্চ একমাত্র 'সংবাদ'-এর শিরোনাম ছিল 'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম'। অন্য কোনো কাগজ এ রকম শিরোনাম দেয়নি। ফলে 'সংবাদ' পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রুদ্ররোষে পড়ে। ২৮ মার্চ 'সংবাদ' ও সংবাদের সাংবাদিক শহীদ সাবেরকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

পাকিস্তান থাকাকালে আর 'সংবাদ' বের হয়নি। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি যেদিন বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসেন, সেদিন 'সংবাদ' বের হয়। অবশ্য অনেক কাগজই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের সময় যথারীতি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক ইউনিয়নের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'পাকিস্তানি দখলদার আমলে আপনাদের অনেকেই দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু অনেকেই আবার এখানে থেকে জেনারেল ফরমান আলীর আশীর্বাদ নিয়ে কাগজ বের করেছেন। আজ ওইসব লোকই প্রগতির নামে সরকারকে সমালোচনা করছে এবং এমনকি স্বাধীনতার মূলে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ওই দখলদার আমলে একমাত্র দৈনিক সংবাদ, পিপল এবং সাপ্তাহিক বাংলার বাণীই ফরমান আলীর বশ্যতা স্বীকার করে প্রকাশিত হয়নি।'

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ 'সংবাদ' বেরুল। বাঁশের খুঁটি, টিনের চালার নিচে কম্পোজ বিভাগ। পোড়া ঘরে, পোড়া মেশিন কিছু সংস্কার করে ছাপার ব্যবস্থা। কাগজে তখন যারা কাজ করতে শুরু করলেন তাদের সবাই অদ্ভুত চরিত্রের। জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ, আওয়ামী লীগ অর্থাৎ সর্বদীয় ভাজাপোড়া সব এক সঙ্গে জুটেছে। টাকা-পয়সার খবর নেই। দেশের অর্থনীতি এবং ব্যবসা দুটোই শূন্যের কোঠায়। আমি নতুন ব্যবসা জোটাতে ব্যস্ত।

ষাটের দশকে 'সংবাদ'-এর কর্তৃপক্ষ কিছু ব্যবসা করে, কিছু ব্যবসা বেচে, কেউ বৌয়ের গয়না বেচে 'সংবাদ' চালিয়েছেন। তাদের কেউই এখন নেই।

বঙ্গবন্ধু চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার আগে মরহুম সৈয়দ নজরুল ইসলামকে বলে গিয়েছিলেন, ইত্তেফাক, বাংলার বাণীর মতো 'সংবাদ' চাইলেই যেন যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিকের লাইসেন্স দেওয়া হয়। 'সংবাদ'-এর ২৬৩ বংশাল রোডের পোড়াবাড়ি অধিগ্রহণ করা হলো। বঙ্গবন্ধুর দেওয়া লাইসেন্সে মেশিন আনা হলো এবং ব্যাংকের টাকায় বাড়িও করা হলো। ধীরে ধীরে 'সংবাদ'-এর প্রতিষ্ঠা বাড়তে শুরু করল নতুন ব্যবস্থাপনায় পুরনো আদর্শের পরিসীমার ভেতরে।

'সংবাদ' এবং দেশের বিপর্যয় চলেছে এক সঙ্গেই। বাকশাল হওয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে 'সংবাদ' বন্ধ করে দেওয়া হলো। কিন্তু কালের চক্রে দেশ থেকে গণতন্ত্র, বাকশাল সবই উড়ে গেল। বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন। বিভীষণ মোস্তাক ক্ষমতায় গিয়ে বাকশাল থেকে নতুন রাজনীতির চেষ্টা করলেন। বেশকিছু আওয়ামী লীগার জুটে গেলেন মোস্তাকের সঙ্গে। মোস্তাক সাহেব 'সংবাদ' পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দিলেন। আবার 'সংবাদ' বেরুলো।

রাজনীতির এই ঘূর্ণিবর্তে মোস্তাক গেলেন, জিয়াউর রহমান এলেন, জিয়াউর রহমান গেলেন, এরশাদ এলেন। নাটকের চরিত্র পরিবর্তন হলো। কিন্তু দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। 'সংবাদ' প্রগতিশীল শক্তির মুখপাত্র হয়েই থাকল; তৃণমূলে পৌঁছাতে পারল না। মধ্যবিত্তের যাদের মনোভাব চিরকালই সুযোগসন্ধানী তাদেরও মুখপাত্র হতে পারল না। একমাত্র 'সংবাদ'-এর কর্মীবৃন্দের দৃঢ় মনোবলের জন্যই 'সংবাদ' বেঁচে থাকল ওয়েববোর্ড এবং আনুষঙ্গিক নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে।

৫০ বছরে পা দিয়ে 'সংবাদ'কে নতুন করে ভাবতে হবে। এখন সংবাদ প্রচার মাধ্যমের যে বিপ্লবী পরিবর্তন হয়েছে, আঙ্গিকের দিক থেকে, প্রযুক্তির দিক থেকে এবং প্রকাশনার দিক থেকে সেখানে 'সংবাদ'কে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই টিকে থাকতে হবে। সেই সঙ্গে নতুন সামাজিক, ব্যবসায়িক চিন্তাধারা, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের চিন্তাধারার সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে আদর্শের ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে।

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'সংবাদ'-এর অবদান ঐতিহাসিক। বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে সংবাদ তার প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। অসাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ ও শোষণমুক্ত সমাজের সম্ভাবনা হচ্ছে 'সংবাদ'-এর আদর্শ। এই আদর্শ থেকে 'সংবাদ'-এর বিচ্যুতি কখনো ঘটেনি এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে না।

এই দীর্ঘ ৫০ বছরে 'সংবাদ'-এ অনেকেই এসেছেন, এদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছেন। অনেকেই এখন বেঁচে নেই। 'সংবাদ'-এর এই ৫০ বছরের জীবনে এদের প্রত্যেকের জীবনী এবং ব্যক্তিগত দান বিশেষভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়, শুধুমাত্র স্থানাভাবে। এদের প্রতি আমরা যারা এখন সংবাদে কর্মরত তাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন রইল।

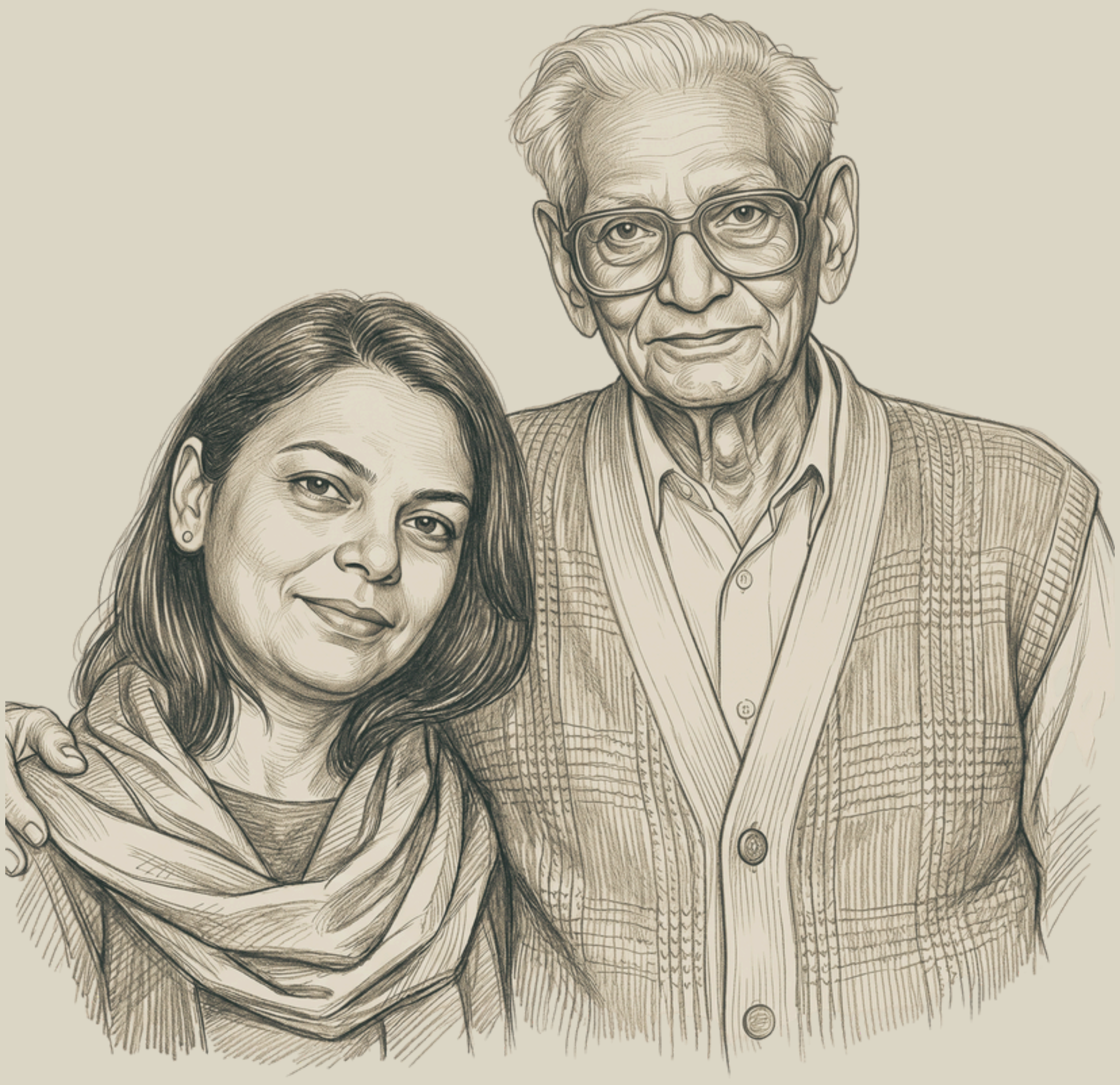

সংবাদ নিয়ে কিছু টুকরো স্মৃতি

নিহাদ কবির

শনিবার, স্কুল ছুটি। ন'টার মধ্যেঘুম থেকে উঠে তৈরিহয়ে ফিটফাট রেডি- আব্বু'র সঙ্গে সংবাদেযাব। সাদা ফোক্সওয়াগন গাড়িতে চড়ে, সে-ই বংশালে। ২৬৩ নং বংশাল রোড।গাড়ি থেকে নেমে ছোট 'উঠান'- কিছুটা শান বাঁধানো, কিছুটানুড়ি-সুরকিতে ঢাকা। বর্ষার দিন হলে শ্যাওলায় আছাড় খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সিঁড়ির নিচে হাতে টাইপ সেটিং হচ্ছে- কাঠের বাক্সে ছোট ছোট খোপে রাখা সিসার অক্ষরগুলো অদ্ভুত দক্ষতায় আর ক্ষীপ্রতায় লাইনে লাইনে বসিয়ে লেখা তৈরি করে যাচ্ছেন শ্মশ্রুমণ্ডিত এমদাদ সাহেব- আব্বু ডাকতেন 'এই মৌলবী- এদিকে আস'- হেসে তাকাতেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ল্যান্ডিংয়ে ছোটঘরে 'উদু' বসে আছে, ছোটখাটো টাক মাথা মিষ্টি ওয়াদুদুল হক। তাকে আমরা, সংবাদ পরিবারের বাচ্চারা আদর করে 'উদু' বলে ডাকতাম। নামটা শহীদ সায়্যিদুল হাসান সাহেবের মেয়ে, প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী শারমিন হাসানের (এখন হোসেন) দেয়া। 'উদু'র কাছে বরাদ্দ ছিল চারটা মিষ্টি, একটি বা দুটি রসগোল্লা, পান্তুয়া, একটি সন্দেশ, মাঝে মাঝে সাথে নিমকি। এক বোতল স্প্রাইট। প্রায়ই সেগুলো নিয়ে চলে যেতাম বজলু চাচার ঘরে। বজলুর রহমান হয়তো গম্ভীরভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ততোধিক তাৎপর্যপূর্ণ লেখা লিখছেন। ঢুকতেই হেসে বলতেন, এসো। বসে পড়েই লেখাগুলো টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করতাম- পাঁচ বছর বয়সে পড়তে শিখে ফেলার পরয়া সামনে পেতাম তাই পড়তাম- এখনওপড়ি। মাঝে মাঝে বজলু চাচা বসিয়ে দিতেন হেডিং লিখতে- বলতেন সাব-এডিটর হওয়া প্র্যাক্টিস কর। প্রুফ রিডিংও করতাম। একদিন নতুন রিপোর্টারদের ইন্টারভিউ হবে। নিউজ উইক থেকে একটুখানি ইংরেজি ডিক্টেশন দেয়া হলো। আমাকে বসিয়ে দেয়া হলো তা চেক করতে। বেশিরভাগ প্রার্থীই "normalcy" শব্দটাকে লিখলেন "normal sea" বা "normal see"।

অদ্ভুত সব ব্যাপারে জোর আলোচনা হতো বজলু চাচার সঙ্গে। গভীর পর্যালোচনা হতো কোন মিষ্টিটা আগে খাওয়া হবেসেটা নিয়ে। যেটা বেশি ভালোলাগে না সেটা কম।একদিন বললেন, যেটা ভালো লাগেনা, সেটা আগে খেলেমুখের রুচি নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তখন পছন্দেরটাও আরভালো লাগবে না। আবার পছন্দেরটা পরে খেলে মুখে স্বাদটা থেকে যাবে, মনও ভালো থাকবে। কিঞ্চিত ভোজন বিলাসী আমি- কোনটা আগে কোনটা পরে খাব- এই ডিলেমার সমাধান এখনও খুঁজে পাইনি।তার কমিউনিস্ট হওয়া নিয়ে ঠাট্টা করতাম, উত্তরে বলতেন ১৬ বছর বয়সের পরে যে কমিউনিস্ট হয় না, সে হৃদয়হীন, আর ৪০-এর পরে যে কমিউনিস্ট থাকে সে বোকা।একদিন নিয়ে গেলেন নৃত্যনাট্য শ্যামা দেখাতে। লায়লা হাসানের পাশে হিরোর রোলে যিনি নাচলেন, তার নাম মনে নেই- বজলু চাচা দেখেই বললেন- বজ্রশেল, বজ্রশেল, বজ্রসেন নয়।

এদিক-সেদিক ঘুরে ফিরে পৌঁছে যেতাম ফটোগ্রাফি সেকশনে, আলম ভাইয়ের কাছে। হাতে ধরে সাদা-কালো ছবি তোলা, ডেভেলপ করা, প্রিন্ট করা শিখিয়ে দিয়ে গেছেন তিনি। তারপর নেগেটিভ থেকে পজিটিভ করা, ছাপার জন্য তৈরি করা- সব। ছবি ডেভেলপ করার জন্য ডার্করুমে ঢুকে অল্প লাল আলোয় কেমিক্যালগুলো ট্রেতে ঢালা, তারপর সেই আলো বন্ধকরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ক্যামেরা থেকে ফিল্ম বের করে ডেভেলপারে দিয়ে অপেক্ষা করে থাকা। মাঝে মাঝে একটুবাতি জ্বেলে হাতের শ্যাডো দিয়ে বিভিন্ন ইফেক্ট দেয়া- নিজেকে বেশ অ্যালকেমিস্ট- অ্যালকেমিস্ট লাগত। আলম ভাই বারবার সাবধান করে দিতেন আন-এক্সপোজ্‌ড্ ফিল্মের বাক্স যেন না খুলি।

তো এই পাগল একদিন সাঁকো নাড়িয়েই ফেলল- দেখিই না কী হয় করে একটা ফিল্ম রোলের ঢাকনা মুহূর্তের জন্য খুলে বন্ধ করে দিলাম। পরবর্তীতে পিতৃদেবের আদালতে সমন- বেশ কয়েক ফুট মহার্ঘ ফিল্ম নষ্ট করে ফেলার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত এবং যথাযথভাবে তিরস্কৃত। এখনও আলম ভাইয়ের তোলা আমার ছবি আমার কাছে সযত্নে রাখা আছে।

আব্বুর ঘরের জানালা দিয়ে আশপাশের পুরনো বাড়ির ছাদ, আলশে, ইটেরফাঁকে বটগাছ- সব দেখা যেত। স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রায় রোজই যেতাম সংবাদে। আব্বু একদিন ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই রোজ এতগুলো কলা খাস কেন? সেই প্রথম বুঝলাম, আমার খাতের খরচের হিসাব ভাউচার হয়ে- 'বড় সাহেবের' ঘরে চলে যাচ্ছে, আর তিনিও রোজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিটি ভাউচার দেখে নিচ্ছেন। আসলে কলা তো আর আমি খাইনি, আব্বুর ঘর থেকে পাশের বাড়ির ছাদে, আলশেতে যে বাঁদরগুলো ঘোরাঘুরি করত, তাদের ডেকে এনে খাওয়াতাম! যাই হোক, তখন থেকেই স্বল্প আয়ের পত্রিকায় ফাইনান্সিয়াল কন্ট্রোলের ব্যাপারটা মনে গেঁথে গেল।

পরে শুনেছিলাম আমার আসকারা পেয়ে বাঁদরগুলো বেশ উৎপাত আরম্ভ করেছিল। জানালা-টানালা খোলা পেলে দিব্যি সম্পাদক মহাশয়ের ঘরে ঢুকে টেবিল-চেয়ারে বসে অফিস করত- গোদাটা আব্বুর চেয়ারেই বসত। একবার তোনতুন গস্ মেশিনের বোতামটিপে অন্ করে রোলারের ফাঁকে এক বাঁদরের লেজ আটকে হুলুস্থুল কাণ্ড।

সংবাদের প্রতি আব্বুর কমিটমেন্ট খুব কাছে থেকেই দেখেছি। '৭৪-এ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া, মার্শাল ল'র আমলে খোলা, সেন্সরশিপের চাপ, চোখ রাঙানি, ধমক চমক- কোনো কিছুকেই পাত্তা দিতেন না। দুর্দান্ত সাহস ছিল। সাম্প্রদায়িকতা সহ্য করতে পারতেন না। বহু প্রতিকূলতার মধ্যদিয়েও পঞ্চাশ বছরাধিক কাল সংবাদকে আগলে রেখেছেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে, অসুস্থ শরীরেও আমাকে জোর গলায় বলেছেন, I will never close Sangbad down.

দুপুর দেড়টার দিকে খোঁজ পড়ত মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য। আব্বুর বিরাট সেক্রেটেরিয়াট টেবিলের ওপর পুরনো খবরকাগজ বিছিয়ে বাড়ি থেকে আসাটিফিন ক্যারিয়ারের বাটিগুলো রাখা হতো। আব্বু ডাকতেন, সন্তোষ দা খেতে আসেন। সন্তোষ কাকা জিজ্ঞেস করতেন, কী আছে? বিফ থাকলে খাব, না হলে থাক। একবার প্রশ্ন করায় বলেছিলেন, বিফ বাড়িতে রান্না হয় না, তাই। সন্তোষ কাকা তখন সংবাদের চিঠিপত্র পাতাটা দেখতেন। বৃহস্পতিবার সম্পাদকীয় পাতায় কোনো উপসম্পাদকীয় থাকত না- শুধু চিঠি। অনেকদিন তার সঙ্গে বসে শত শত চিঠির স্তূপ থেকে চিঠি বেছে দিয়েছি, মতামতগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। বিরাট লম্বা তোহা চাচা। তোহাখান একদিন নিয়ে এলেন তারবই রূপসী সুন্দরবনের ঝকঝকে নতুন ছাপা কপি।এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম গাজীকালু, বনবিবি, পচাব্দী গাজী, নবাবদি গাজীর গল্প। ঢোলা পাজামা পরতেন তোহা চাচা, তার এক পায়ের একটা খোলের মধ্যেই মনে হতো আমার মতো কয়েকজন নির্বিবাদে ঢুকে যেতে পারবে।ঋষি সদৃশ রণেশ কাকা- তাঁর করা ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতার অনুবাদ অনবদ্য- আজও পড়ি।

সংবাদ যখন পুরানা পল্টনে চলে এলো, তখনআর তত বেশি যাওয়া হতো না। বিদেশে লেখাপড়া করি, ছুটিতে দেশে এলে যাই। কথাশিল্পী শওকত ওসমান প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, ধূমকেতুর মতো উদয় হয়ে হাঁক দিতেন- মাসি, কেমন আছ? এক পেয়ালি চা খাওয়াও তো। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্ ব্যাংক থেকে অবসর নিয়ে সংবাদে। বাংলাদেশের মুদ্রা এবং ব্যাংক নোটের Collector's Set দিলেন একটা আমাকে। তার স্নেহময় সম্বোধন- 'মা-জননী' এখনও প্রতিধ্বনিত হয়- সংবাদের দেয়ালে দেয়ালে। সব্যসাচী সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হকের সঙ্গে সাহিত্যে ভাষার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছি, কৈশোরের দুরন্ত সাহস আর স্পর্ধা নিয়ে।

আবছাভাবে মনে পড়ে, স্বাধীনতার আগে, বছর চারেক বয়স হবে- শহীদুল্লাচাচা, শহীদ শহীদুল্লা কায়সার, ফোক্স ওয়াগন গাড়ি চালাতে শিখছেন। শুনেছি সারা ঢাকা শহর সেকেন্ড গিয়ারে- অতিক্রম করে গাড়ি চালাতে শিখে গিয়েছিলেন। আব্বুর সঙ্গে জহুর হোসেন চৌধুরীর বাড়িতে গিয়েছি। তার দরাজ গলা আর হাসির শব্দ মনে আছে।একটু একটু মনে পড়ে মীর মাহবুব আলীকে।

আজ মনে হয়, এতছোট ছিলাম আর তারা সংবাদপত্র জগতের পথিকৃৎ, মহীরুহ। বিশাল মাপের সাহিত্যিক, সর্বোপরি বিশাল মনের মানুষ। কিন্তু কোনোদিন অবজ্ঞা করেননি, হেলাফেলা করেননি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভাণ্ডার উজার করে দিয়েছেন। তাদের স্নেহ এবং প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠে দেশ, সংবাদপত্র, সাহিত্য, রাজনীতি সবক্ষেত্রে সহজেই বিচরণ করতে শিখেছি। তাঁদের অসমবয়সী সাহচর্যের এ সৌভাগ্য অমূল্য।

লেখক: নিহাদ কবির; ব্যারিস্টার, সংবাদ-এর প্রয়াত প্রধানসম্পাদক আহমদুল কবিরের কন্যা

[লেখাটি 'সংবাদ'-এর ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত লেখা থেকে পুনর্মুদ্রিত]

সংবাদ

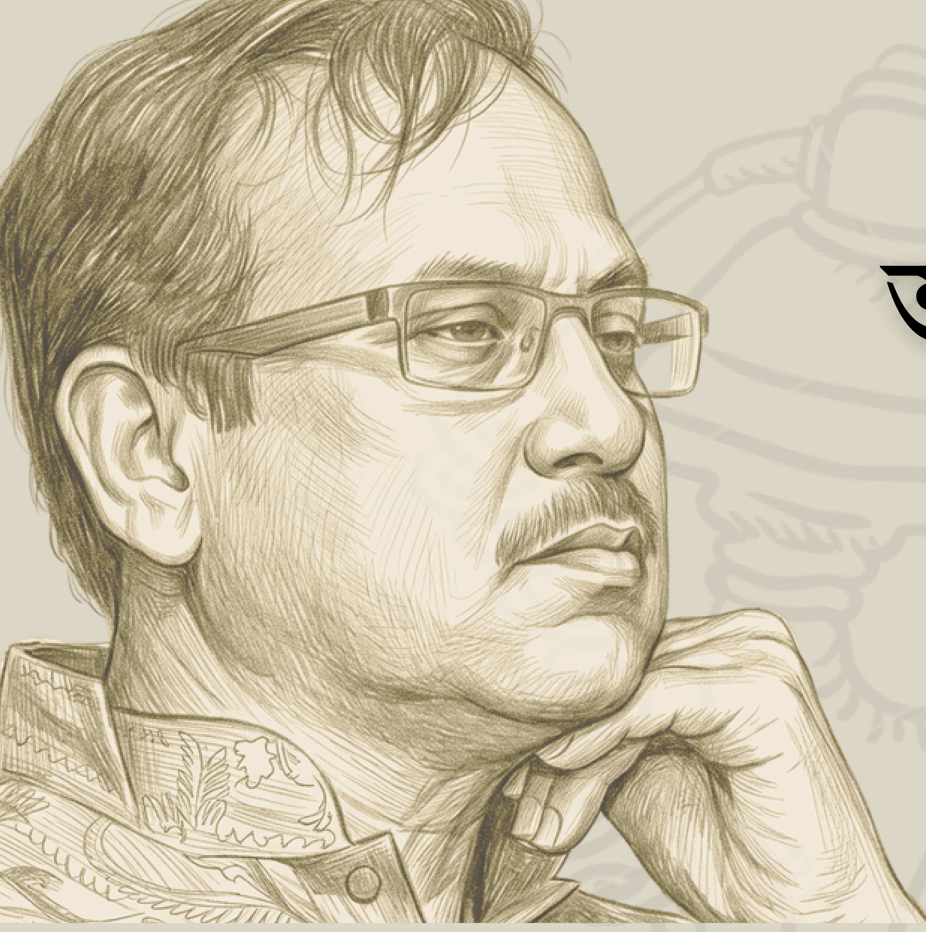

অ্যানালগ আর ডিজিটাল যুগের রিপোর্টার

রাশেদ আহমেদ

টিএন্ডটি ফোনে ওপার থেকে বলা হলো ‘সানকিপাড়া’ আর আমি ‘স’ এর বদলে ‘খ’ শুনলাম। ঢাকা থেকে বাসে চড়ে গেলাম ময়মনসিংহ টার্মিনালে। রিকশাওয়ালাকে কি করে যে এমন জায়গার নাম বলি! মুখের মধ্যে ‘খ’ উচ্চারণটি আধো রেখে বললাম যাবে নাকি? উত্তর, ‘উডুন, যাইতাম।’ চেপে বসলাম। আর মনে মনে প্রতিনিধিকে বকতে লাগলাম। এমন একটি জায়গার লোকেশন কেন দিলো? রিকশা চলছে ময়মনসিংহ শহরের ইটের খোয়া উঠে যাওয়া ভাঙাচোড়া রাস্তা দিয়ে। এর আগে আমি কখনও এই শহরে আসিনি। বৃটিশ সময়ের পুরোনো শহর। মাঝে মাঝে সেই ঐতিহ্যের ছাপ উঁকি দিচ্ছে। প্রায় আধ ঘণ্টা ঘুরে একটি মোড়ে এসে রিকশা থামলো- ‘নামুইন’। জিজ্ঞেস করলাম, এখানে নাকি। চালকের হ্যাঁ সূচক জবাব। রাস্তার দু’পাশে তাকিয়ে দেখি দোকানের সাইন বোর্ডে লেখা সানকিপাড়া। আমি মুখে যা-ই বলি না কেন রিকশাওয়ালা বুঝতে ভুল করেনি। আমার ভ্রান্তি ভাঙলো। এটি একটি আবাসিক এলাকা। যাহোক সেখান থেকে আমার কাজে গেলাম। এই ঘটনা ১৯৮৯ সালের শেষ দিকের। তখন টিএন্ডটি টেলিফোনে এক জেলা থেকে আরেক জেলায় লাইন প্রায় ডিস্টার্ব দিতো। অনেক সময় কথা অস্পষ্ট শোনা যেতো, বিভ্রাটও হতো। আমার মতো ওই সময়ে ফোনের এ রকম বাজে অভিজ্ঞতা কম বেশি সবারই আছে।

যারা ৮০ দশকে বা ৯০ দশকে সাংবাদিকতা শুরু করেছেন তাদের অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত অনেক পরিবর্তন দেখতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। অবশ্য এরও আগের সাংবাদিকদের আরও পুরোনো অভিজ্ঞতা আছে এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি ৮০ দশকের একেবারে শেষের দিকে সাংবাদিকতার কলম ধরি। এর আগে স্কুল-কলেজে ম্যাগাজিন বের করার অভিজ্ঞতা অর্জন করি নিজের শিল্প-সংস্কৃতি মনন প্রকাশ করার তাগিদ থেকে। তখন ছিল টাইপো প্রেসের যুগ। সিসার অক্ষর বসিয়ে বসিয়ে ফ্রেম তৈরি করে মেশিনে তোলা হতো। ছবি ছাপতে ব্লক লাগতো। কারিগররা লাইন ব্লক হাতে তৈরি করতেন। হাফটোন ব্লকের জন্য প্রয়োজন হতো ক্যামেরা ও স্ক্রিনের, সেই সঙ্গে দক্ষ কারিগর। সেই যুগে একটা ম্যাগাজিন বের করতে কতো যে ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হতো নতুন প্রজন্মের অনেকেই তা অনুধাবন করতে পারবেন না। যা হোক ৮০ দশকের শেষে যখন সাংবাদিকতা শুরু করি তখন জোহানেস গুটেনবার্গের ছাপাখানার বড় পরিবর্তন এসেছে। অফসেট লিথোগ্রাফি, গ্র্যাভিউর, অটোপ্লেট প্রসেসর কতো কি এলো। আরও এলো ফোর কালারে এক সঙ্গে ১৬ পৃষ্ঠা ছাপার মেশিন। খবরের কাগজে রঙিন ছবি, রঙিন হেডলাইন, নতুন এক আমেজ। কিন্তু সংবাদিকদের প্রযুক্তির ব্যবহার তখনও হাতে আসেনি। হেঁটে হেঁটে অফিসে বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবর সংগ্রহ করতে হতো। সন্ধ্যার পর সেই খবর নিয়ে ঢুকতে হতো পত্রিকা অফিসে। স্ক্রিপ্ট লিখতে হতো নিউজপ্রিন্ট কাগজের বানানো এক ফুট বাই ৬ ইঞ্চি প্যাডে। নিউজ এডিটর কপি এডিট করতেন কলম খুঁচিয়ে। এরপর টাইপ হলে যেতো প্রুফ রিডার টেবিলে। তারা এসএসসি পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করার মতো জোরে জোরে স্ক্রিপ্ট পড়ে ভুল বানান সংশোধন করতেন। কম্পিউটার রুমে সংশোধিত কপির প্রিন্ট বের হতো ট্রেসিং পেপারে। কম্পিউটার রুমে সবার যাওয়ার পারমিশন ছিল না।

কারও প্রয়োজন হলে প্রার্থনা ঘরের মতো জুতা-মুজা খুলে ঢুকতে হতো। ট্রেসিং পেপারগুলো আট কলামের সেলোফিনে স্বচ্ছ শিটে সাজিয়ে স্কচটেপ দিয়ে আটকিয়ে মেকআপ করা হতো। পরে অনেকটা এক্সরের মতো এক মেশিনে দিয়ে ডিমাই সাইজের সেই শিটের নেগেটিভ বানানো হতো। নিউজের সেই নেগেটিভকে আবার রে দিয়ে প্লেটে বসানো হতো। এক একটি প্লেট মানে পত্রিকার দুই পৃষ্ঠা। প্লেট থেকেই ছাপা হতো হাজার হাজার কপির সংবাদপত্র। তখন কোনো সংবাদ আপডেট হলে মাঝরাতে ছাপা বন্ধ করে প্লেট বদল করতে হতো। সে ক্ষেত্র বাতিল হতো ছাপা হয়ে যাওয়া কাগজগুলো। উদাহরণ দেয়া যাক, যেমন জাতীয় পার্টির নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, রাত ১২টা পর্যন্ত আমরা এটাই রিপোর্ট করলাম। রাত ২টার দিকে জানা গেলো তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তখন ছাপা বন্ধ করে আবার সংশোধিত নিউজ দিয়ে প্লেট তৈরি করে ছাপানো হতো। অনেক সময় ঢাকার এডিশনে আপডেট নিউজ থাকতো আর ঢাকার বাইরের এডিশনে যেতো আগের নিউজ। বিশেষ কারণে কখনও পত্রিকার ৪টি এডিশনও হতো।

আমরা যারা রিপোর্টার ছিলাম তাদের খবর সংগ্রহে হতে হতো অনেক সতর্ক, অনেক যত্নবান। নিউজ লিখতে বসলে এখনকার মতো হাতের কাছে ৫টি অনলাইন পোর্টাল খুলে দেখার সুযোগ ছিল না। ম্যাসেঞ্জার বা হোয়াসঅ্যাপে স্ক্রিপ্ট শেয়ারও করা যেতো না। হতো না হুবহু কপি পেস্ট। প্রত্যেকে নিজ নিজ মেধা দিয়ে লিখতেন। অ্যাসাইনমেন্টে গেলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নোট নিতে হতো। লেখার সময় সেটি বারবার খুঁজে দেখতে হতো। যাতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পড়ে না যায় বা ভুল না হয়ে যায়। অনেক ইনফরমেশনও মনে রাখতে হতো। পুরোনো তথ্য পেতে যেতে হতো পাবলিক লাইব্রেরি, প্রেস ইনস্টিটিউটে বা পত্রিকা অফিসের পুরোনা পত্রিকা ঘাঁটতে হতো। তখন প্রত্যেক রিপোর্টারের লেখার স্টাইল ছিল আলাদা। একই অ্যাসাইনমেন্ট কাভার করেছেন বিভিন্ন পত্রিকায় দেখতাম ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলে রিপোর্ট হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকের নাজীমউদ্দিন মোস্তান, মতিউর রহমান চৌধুরী, দৈনিক বাংলার জহিরুল হক, সংবাদের শওকত মাহমুদ, মোনাজাত উদ্দিন, বাংলার বাণীর ফারুক কাজী, খবরের আশরাফ খান, সুনীল ব্যানার্জি, শফিকুর রহমান, অরুণাভ সরকার, মাহমুদ শফিক, সৈকত রুশদী- এদের দেখতাম নিজস্ব ঢঙে রিপোর্ট লিখতে। এছাড়া শাহজাহান সরদার, হাসান শাহরিয়ার, জাফর ওয়াজেদ, সাইফুল আলম, আমীর খসরু - এদেরও লেখার একটা ঢঙ ছিল। বিবিসির আতাউস সামাদ ও ভয়েজ অব আমেরিকার গিয়াস কামাল চৌধুরীও ভাষার ভালো দখল রেখে স্ক্রিপ্ট লিখতেন। আমরা তাদের ফলো করতাম। আরও নাম আছে কিন্তু এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

বাসা থেকে বের হতাম প্রতিদিন সকালে। অ্যাসাইনমেন্ট থাকলে সেটি তো করলামই, পাশাপাশি বিশেষ রিপোর্টের খোঁজে যেতাম নানা অফিসে। কয়েকদিন ঘুরে একটি ভালো রিপোর্ট পাওয়া যেতো, সেটি আবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য না পেলে নিউজ এডিটর ফিরিয়ে দিতেন-যাও কর্তৃপক্ষের বক্তব্য নিয়ে আসো। না হলে যাবে না। গিয়ে বসে থাকতে হতো কর্তৃপক্ষের অফিসে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য না পাওয়ায় কতো রিপোর্ট যে আলোর মুখ দেখেনি তার হিসাব নেই। আমার সরাসরি এডিটর ছিলেন কে জি মোস্তাফা। রিপোর্টের স্ক্রিপ্টে অসঙ্গতি পেলে ছিঁড়ে ফেলে বলতেন ‘কিল্ড’। আরেক এডিটর ছিলেন বজলুর রহমান। ভুল তথ্য তো সহ্যই করতে পারতেন না। মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল ছিলেন আমার নিউজ এডিটর।

একবার টিএন্ডটি অফিসের দুর্নীতি নিয়ে একটি রিপোর্ট করলাম। দৈনিক সংবাদের মালিক আহমদুল কবিরের কাছে টিএন্ডটির চেয়ারম্যান নালিশ করলেন। আহমদুল কবির রুমে আমাকে ডেকে পাঠালেন। এই ফাঁকে সকালে নিজেই টিএন্ডটি অফিসে গিয়ে খোঁজ-খবর নিলেন। যখন তার রুমে ঢুকলাম বললেন, তোমার ডকুমেন্টগুলো কোথায়? দেখালাম। ‘রিপোর্টটি ঠিকই আছে, নিজে গিয়ে দেখেছি’। তারপর বললেন, এই রিপোর্টে তোমার ঘাটতি কোথায় ছিল জানো? তুমি চেয়ারম্যানের ভাষ্য নাওনি। এটি করলে তিনি অভিযোগ জানানোর সুযোগই পেতেন না। আহমদুল কবিরের সেদিনের পরামর্শ পরবর্তীতে আর ভুলিনি।

আমাদের ঢাকার বাইরে সফরে গেলে নিউজ পাঠাতে হতো টেলিফোনে। সেই টেলিফোন আবার সব জায়গায় ছিল না। কোনো সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতার বাসা এবং সার্কিট হাউসের টেলিফোন ব্যবহার করতে হতো। এসব জায়গাতেই কেবল এসটিডি (সাবসক্রাইবার ট্রাঙ্ক ডায়েলিং) টেলিফোন পাওয়া যেতো। টিএন্ডটি টেলিফোন ছিল তিন ধরণের, লোকাল, এসটিডি ও আইএসডি। সার্কিট হাউস বা অন্য কোথাও সুযোগ না পেলে ধরনা দিতে হতো স্থানীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিসে। বৃষ্টি বাদল বা নানা কারণে লাইন খারাপ থাকতো। এ প্রান্ত থেকে বলতাম এক কথা আর অপর প্রান্তে শুনতো আরেকটা। যদি বলতাম ‘ভালো’ সেটি শুনতো ‘কালো’। যদি বলতাম বীরগঞ্জ শুনতো পীরগঞ্জ। কতো যে জায়গার নাম ভুল শুনেছে কতোজনে? তখন চিৎকার করে অক্ষর বলা বা নানা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হতো।

জেলা শহরে রাজনৈতিক সফরে গিয়ে লাইনের সিরিয়াল ধরে নিউজ পাঠানোর অভিজ্ঞতা এখনকার পঞ্চাশোর্ধ সব সাংবাদিকেরই আছে। শেখ হাসিনা ১৯৯১-৯৫ সালে ছিলেন বিরোধী দলীয় নেত্রী। তখন তার রাজনৈতিক সফরে অ্যাসাইনমেন্ট পড়েছে অনেক। জনসভা শেষে নিউজ পাঠাতে অনেকদিন সার্কিট হাউসে তার রুমের টেলিফোনও ব্যবহার করেছি। অনেক ক্ষেত্রে ফেরার দিন হয়তো রাত ১০টায় পৌঁছাবো গাড়িতে বসে স্ক্রিপ্ট লেখা শেষ করতাম। অফিসে ঢুকে রিপোর্ট জমা দিয়ে ছাপা পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতাম। তখন বাসায় যেতে যেতে রাত ২টা থেকে আড়াইটা বাজতো। এমনিতেই প্রতিরাতে বাসায় যেতে হতো রাত ১২টা অথবা ১টায়। অ্যাসাইনমেন্টই দেয়া হতো রাত ১১টার পর। অ্যাসাইনমেন্ট না দেখে অফিস ত্যাগ করা বারণ ছিল। আমি যখন সংবাদে চাকরি করি অফিসের গাড়ি অর্থাৎ বেবি ট্যাক্সি বা স্কুটার ছাড়তো রাত সাড়ে ১২টায়। এর আগে অফিস ছাড়লে যেতে হতো নিজের ব্যবস্থাপনায়। ১৯৯৬-৯৭ সালে যখন ঢাকার বাইরে সকালে পত্রিকা পৌঁছানোর জন্য ছাপা এগিয়ে আনা হলো তখন অবশ্য রাত সাড়ে ১০ থেকে ১১টার মধ্যে ছুটি হতো। অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হতো সাড়ে ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে। সংবাদে আমার আরেক সম্পাদক ছিলেন বজলুর রহমান। তিনি তখন প্রায়ই বলতেন কেউ ৮/৯টায় বাসায় যেও না হয়তো ভেবে বসতে পারে চাকরি চলে গেছে। সাংবাদিকদের মাঝরাত ছাড়া বাসায় যাওয়ার কালচার নেই। বজলু ভাই প্রায়ই বলতেন তাদের আমলে বাসায় যেতেন রাত ২টার পর। মতিয়া চৌধুরীর সঙ্গে তার যখন বিয়ে হয় প্রথম প্রথম মতিয়া আপা নাকি রাতের খাবারের জন্য অপেক্ষায় থাকতেন। বজলু ভাই তখন বলে দিলেন এভাবে অপেক্ষা করলে এক সময় বিরক্ত হয়ে যাবে। তার চেয়ে খাবার টেবিলে রেখে তুমি ঘুমিয়ে যেও। এসব বজলুর রহমানের মুখ থেকেই শোনা। শেষ রাতে ছাপা শেষে গরম পত্রিকা হাতে নিয়ে বাসায় যাওয়ার গল্প সন্তোষ গুপ্ত, ফয়েজ আহমদ, কামাল লোহানীসহ ওই প্রজন্মের অনেক সাংবাদিকই করেছেন। ফয়েজ আহমদের তো বই রয়েছে ‘মধ্যরাতের অশ্বারহী’ নামে। সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা আলতাফ মাহমুদ প্রায়ই বলতেন, পত্রিকার ছাপার সিডিউল এগিয়ে গেলেও তিনি কখনো রাত ১২টার আগে বাসায় ঢুকতেন না। কোনো কারণে আগে চলে গেলেও বাসার সামনে ঘোরাঘুরি করতেন। ঢুকতেন ১২টা বাজার পর।

৯০ দশকের প্রথম দিকে ফ্যাক্স মেশিন আমাদের রিপোর্ট পাঠানো কিছুটা সহজ করে দেয়। দূরের কোথাও অ্যাসাইনমেন্টে গেলে বড় সাদা কাগজে নিউজ লিখে কোনো দোকান থেকে ফ্যাক্স করে দিতাম। এটির খরচ অবশ্য নিজের বহন করতে হতো। টেলিফোনে নিউজে শব্দের বা বাক্যের যে বিভ্রাট হতো সেটি থেকে মুক্তি মিললো তখন। তবে অনুসন্ধানী বা বিশেষ রিপোর্ট অফিসে এসেই লিখতে হতো, সময় নিয়ে। তখন বাই নেইম রিপোর্ট খুব কম হতো। রিপোর্ট হতো কিন্তু রিপোর্টারের নাম খুব কম যেতো। বেশি ভালো রিপোর্ট হলে সেখানে নিউজ এডিটর নাম বসাতেন। এর বাইরে নয়। আবার অনেক বিশেষ রিপোর্ট নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারে তাই রিপোর্টারের নাম দেয়া হতো না।

এরপর মোবাইল ফোন এলো কিন্তু সাংবাদিকদের কেনার সামর্থের মধ্যে ছিলো না। ব্যবহার করতেন ব্যবসায়ীরা। কিছু কিছু রাজনীতিবিদ অবশ্য ব্যবহার শুরু করেন তখন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোবাইল ফোনের লাইসেন্স কয়েকটি কোম্পানিকে দিলে বাজার সহজ হয়। কিন্তু বিল এতো বেশি, ব্যবহার করা কঠিন ছিল। প্রতি মিনিট কলরেট ছিল ৭টাকা।

তবুও এই সময়ে তথ্য আদান-প্রদান অনেক সহজ হয়ে যায়। আমরা তখন টিএন্ডটির মাধ্যমে নেতা অথবা ব্যবসায়ীদের কাছে ফোন করে তথ্য নিতাম বা গতিবিধি জানতাম। আগেতো ল্যান্ড ফোনে সবাইকে পাওয়া যেতো না। কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে পাওয়ার কাজটি সহজ হলো।

কিন্তু বিপরীতে ক্ষতিও হলো। রিপোর্টাররা পরিশ্রম কমিয়ে দেয়ায় খবরের গভীরতা কমে গেলো। স্পট থেকে ঘুরে এসে রিপোর্টের যে ধার সেটিতো আর টেলিফোন বা অন্যদের কাছ থেকে শুনে থাকার কথা নয়। টেলিফোনে নিউজ খাওয়ানো শুরু হলো। বিভ্রান্তিকর তথ্যে গুজব সংবাদ বেড়ে গেলো।

দৈনিক যুগান্তরে যখন কাজ করি, সম্পাদক ছিলেন গোলাম সারওয়ার। একটা মহীরুহ। তার কাছে স্ক্রিপ্ট গেলে রিপোর্টারকে ডেকে দাঁড় করিয়ে স্ক্রিপ্টে কলম দিয়ে খোঁচাতেন আর বলতেন কী লিখেছো? হয়েছে কিছু? এখনও লেখা শেখোনি। তারপর এডিট করতেন নিজের মতো করে। পরদিন বড় হেডলাইনে নিজের নামে রিপোর্টটি যখন ছাপা দেখতাম, মনটা ভরে যেতো। এই পত্রিকায় কিছুদিনের জন্য মুসা ভাইকে (এবিএম মুসা) পেয়েছিলাম। পরে তাকে যেকোনো দরকারে ফোন দিলে সহযোগিতা করতেন। ছিলেন তথ্যের ভাণ্ডার। এমন আরেকজনকে পেয়েছিলাম সংবাদে মকবুলার রহমানকে। তার নাম দিয়েছিলাম চলন্ত এনসাক্লোপিডিয়া।

আমাদের একঝাঁক তরুণকে নিয়ে সারওয়ার ভাই ২০05 সালে দৈনিক সমকাল পত্রিকার যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেখানেও তার দক্ষতা দেখেছি। এক মাসের মধ্যেই পত্রিকাটির সার্কুলেশন হু হু করে বাড়তে লাগলো। রিপোর্টারের কাছ থেকে কী করে কাজ আদায় করতে হয় তিনি ভালো করে জানতেন। কাজে আমাদেরও তাগিদ ছিল এটা দাবি করতে পারি। ওই সময় এরশাদ ও বিদিশার ঘর ভাঙার ব্রেকিং নিউজ দিয়েছিলাম। পরদিন তিনি আমাকে পাঠালেন যে কাজীর মাধ্যমে এরশাদ তালাক দিয়েছিলেন তাকে খুঁজে বের করতে। এরপর এরশাদের সম্পদের হিসাব বের করতে বললেন। আবার বললেন বিদিশার সাক্ষাতকার নিতে। এভাবে অনেকদিন ইস্যুটি ধরে রাখলেন পত্রিকায়। এমন করেই পাঠক ধরে রাখতে হয়-এই কৌশলটি ভালোই জানতেন সরওয়ার ভাই।

সম্ভবত ১৯৯৮ কি ৯৯ সালে এরশাদ ও জিনাত মোশাররফের পরকীয়ার রিপোর্ট করার পর জাতীয় পার্টি আরেকবার ভেঙেছিল। শুধু তাই নয় জিনাতের স্বামী মোশাররফ হোসেন সেবার তাকে তালাকও দিয়েছিলেন। এই রিপোর্টটি করি দৈনিক সংবাদে। এরশাদের সঙ্গে কথা বলতে তখন নিউজ এডিটর বুলবুল ভাই (মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল) ও চিফ রিপোর্টার কাশেম ভাই (কাশেম হুমায়ুন) একসঙ্গে গিয়েছিলাম গুলশানের বাসায়। সাক্ষাতকারে এরশাদ স্বীকার করেন জিনাতের সঙ্গে তার ১৪ বছর ধরে প্রেম চলছে।

২০০০ সালের শুরুতে গণমাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এলো। প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে এলো ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া। একুশে টেলিভিশন যাত্রা শুরু করলো। এরপর চ্যানেল আই। পরে সংবাদ বুলেটিন যুক্ত হলো এটিএন বাংলায়। শুরুর দিকে এই মাধ্যমে কাজ করা আমার কাছে সাংবাদিকতা মনে হতো না। তাই ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় চাকরি করার আগ্রহও দেখাইনি। কিন্তু স্রোত তখন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দিকে। একুশের সাংবাদিকরা রাতারাতি স্টার বনে গেছেন। বেতনও ভালো, অ্যাসাইনমেন্টে গাড়ি সুবিধা পাওয়া যায়। এসব আকর্ষণ ও আলমগীর ভাইয়ের (শাহ আলমগীর) আহ্বানে উৎসাহিত হই। চ্যানেল আই দিয়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যাত্রা শুরু। তারকা পরিচিতি পেলেও সৃষ্টিশীলতায় আনন্দ পাচ্ছিলাম না। মনে হতে লাগলো হালকা ধরনের কাজ। বাইটনির্ভর সাংবাদিকতা টেলিভিশনকে বেশিদূর এগিয়ে নিতে পারবে না। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও বার্কলের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক প্রণব বর্ধনও তার আত্মজীবনীতে টেলিভিশন সম্পর্কে একই কথা লিখেছেন। তাই হলো শুরুর দিকে এসব রিপোর্টিং দর্শকপ্রিয়তা পেলেও আস্তে আস্তে কমতে লাগলো। কারণ মানুষ পত্রিকাতেই অনুসন্ধানী অনেক খবর পাচ্ছে। টেলিভিশনগুলো সে জায়গাতে পিছিয়ে আছে।

সংবাদপত্রের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে শুরু করলাম। টেলিভিশনে ২০০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে চ্যানেল আইতে আমার করা ভুয়া ভোটার তালিকার রিপোর্ট সাড়া ফেলে দেয়। ওই সময় দেশে ১ কোটি ২০ লাখ ভুয়া ভোটার হয়েছিল আমার অনুসন্ধানে বের হয়ে আসে। সুপ্রিম কোর্ট ওই ভোটার তালিকা বাতিল করে দেয়। দৈনিক প্রথম আলো তখন সেই রিপোর্ট কপি করে ব্যানার লিড করেছিল। বিষয়টি ছিল সহজ, ৫ বছর আগের ভোটার তালিকা ও সবশেষ তালিকার পার্থক্য দেখে পরিসংখ্যান ব্যুরো অফিসে গেলাম। ৫ বছরে কতো লোক ১৮ বছর পূর্ণ বা ভোটারযোগ্য হয়েছে। আর মৃত্যুর হার কতো। এই হিসেব বের করে অসামঞ্জস্যতা খুঁজে পাই। এরপর শুরু করি ফিল্ড লেভেলে কাজ। স্থানীয় নির্বাচন অফিস থেকে নতুন ভোটার তালিকা নিয়ে ঠিকানা অনুযায়ী বাড়ি বাড়ি গিয়ে সঠিকতা যাচাই করি। ব্যস, গড়মিল বের হয়ে আসে। এই উদাহরণটি দিলাম নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের জন্য। তারা যেন এভাবেই খবরের ভেতরের খবরের জন্য তাগিদ অনুভব করেন।

তবে টেলিভিশনের শুরুর দিকে আমাদের কাজ এখনকার মতো এতো মসৃণ ছিলো না। অ্যাসাইনমেন্ট শেষে দৌঁড়াতে হতো অফিসে। ঢাকার বাইরে গেলে সেখান থেকেও নিউজ পাঠাতে অনেক যন্ত্রণা ছিল। ডিএসএনজি গাড়ি গেলে হয়তো সহজ হতো কিন্তু স্যাটালাইট ভাড়া অনেক বেশি তাই কর্তৃপক্ষ রাজি হতো না। রাজনৈতিক সফরে গেলে জনসভা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখেই একটি স্ক্রিপ্ট তৈরি করে ক্যামেরায় ভয়েসওভার দিয়ে সেই ক্যাসেট প্রধানমন্ত্রী অথবা বিরোধী দলীয় নেত্রীকে বহন করা হেলিকপ্টারে দিয়ে দিতাম।ঢাকার বিমান বন্দর থেকে সেই ক্যাসেট অফিসের লোক গিয়ে নিয়ে যেতো। বুলেটিনে ধরানোর জন্য কখনও কখনও দূর পাল্লার বাসেও ক্যাসেট পাঠিয়েছি। কোনো কোনো সময় অ্যাসাইনমেন্টে বেরুবার আগে অফিসে আগাম ভয়েসওভার দিয়ে যেতাম। পরে ছবি পাঠাতাম মেইলে। একুশে টেলিভিশনে থাকা অবস্থায় ২০০৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে নির্বাচনী সফরে যাই।

সকাল বেলা রওনা দেয়ার আগে একটি বড় স্ক্রিপ্টের ভয়েস দিয়ে গিয়েছিলাম। বলে গিয়েছিলাম কেটেছেঁটে যতোটুকু কাজে লাগানো যায় সেটুকু ব্যবহার করতে। ফুটেজ মেইলে পাঠাবো। সেই সফরে সিরাজগঞ্জের হাটিকমরুলে মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়ি। তখন বেলা ১টার বুলেটিনে অফিসের সঙ্গে টেলিফোনে যুক্ত ছিলাম। জীবন মৃত্যুর মুখে পড়ে নিজেই লিড নিউজ হয়ে যাই। তখন কতো মানুষ যে আমার জন্য দোয়া করেছে তার হিসাব নেই। টেলিভিশন চ্যানেলের সেই ক্রেজ আর নেই।

টেলিভিশন মিডিয়াকে এখন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে নিউমিডিয়ার। ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, ইন্সট্রাগ্রামসহ কতো কতো মিডিয়া। এসব মাধ্যমে আনএডিটেড অনেক খবর প্রচার হচ্ছে। দর্শকও লুফে নিচ্ছেন। ইদানিং দেখা যায় অনেক খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় আগে বের হয়। সেখান থেকে টেলিভিশনগুলো তুলে নেয়।

আগে সংবাদপত্রের হুমকি ছিল ডিজিটাল মিডিয়া। এখন টেলিভিশনও এর হুমকির মধ্যে পড়েছে। সেখানে ভিন্নতা দেখাতে না পারলে পিছিয়ে থেকে থেকে মৃত্যুর মুখে চলে যাবে। কারণ সব বিজ্ঞাপন চলে যাবে ডিজিটাল মিডিয়ায়।

গবেষণার তথ্যে দেখা গেছে, মাত্র কয়েক বছর আগেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মানুষ টেলিভিশনের প্রাইম টাইম প্রোগ্রামগুলো দেখতো। বর্তমানে মাত্র ১৪ শতাংশের নিচে দর্শক তা দেখে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও অনেকটা এরকম পরিসংখ্যান।

বর্তমানে দেশে ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ সেল ফোন ব্যবহার করছে। যুব সম্প্রদায়ের প্রায় শতভাগের হাতেই মোবাইল। আছে স্মার্ট ফোন, ল্যাপটপ, নোটবুক, ট্যাব। এর মাধ্যমে খবর, বিজ্ঞাপন, শিক্ষা, বিজ্ঞান, বিনোদন যাবতীয় উপাদান সবার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এবং উপভোগও করছে। এ সবের কারণে সংবাদপত্রতো বটেই ইলেকট্রনিক মিডিয়াও আবেদন হারিয়ে ফেলছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার বাধাহীন ও বাছবিচারহীনতার যুগে কোনটি নির্ভরযোগ্য কোনটি নির্ভরযোগ্য নয় তা বলা মুশকিল। তবে প্রতিষ্ঠানিক গণমাধ্যমে পেশাদারিত্বের সঙ্গে যাচাই-বাছাই করে সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার করার নিয়ম এখনও আছে। আগামীতে এটিই গ্রহণযোগ্য থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ জন্য বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে হবে। এই বস্তুনিষ্ঠতার হালটি শক্ত হাতে ধরতে হবে নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদেরই। খবরের ভেতরের খবর দিতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া গুজব দিয়ে আকাশ অন্ধকারে ঢেকে দিক। সেখানে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাবে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতাই। আজকে যারা সংবাদপত্র, অনলাইন পোর্টাল বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সাংবাদিকতা করছেন তাদের মধ্যে অনেক ঘাটতি দেখি। পরিশ্রম করতে চান না, পড়াশুনা করতে চান না।

লেখার কথাতো বাদই দিলাম। নিজের লেখা স্ক্রিপ্ট নিজেই বুঝতে পারেন না। জিজ্ঞেস করলে বলেন, কী যেন বোঝাতে চেয়েছিলাম। ভারতের বিখ্যাত সাংবাদিক হামিদ বে তার একটি লেখায় লিখেছেন, রিপোর্টাররা খবরের জন্য অপেক্ষা করে যতো সময় ব্যয় করেন তার এক চতুর্থাংশও লেখার পেছনে ব্যয় করেন না। এ কারণে গাঁথুনি সুন্দর হয় না। নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের এই জায়গাটিতে মনোযোগী হতে হবে। সেই সঙ্গে নিজেদের তথ্যের ভান্ডার বানাতে হবে। একজন সাংবাদিকের সঙ্গে যে কারোরই দেখা হলে প্রথম প্রশ্নটি করেন, কী খবর আছে? অর্থাৎ তার কাছ থেকে অনেক কিছু জানার প্রত্যাশা করেন।

সাংবাদিক জাওয়াদুর রহমান পিআইবিতে অনেক আগে এক ট্রেনিংয়ে বলেছিলেন, একজন সাংবাদিকের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হচ্ছে সবশেষ তথ্যটি জানা। আর এটি জানতে গেলেই তার যোগাযোগ বাড়বে। যোগাযোগ বাড়লেই রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে আমলা, ব্যবসায়ী সবাই তাকেই তথ্য শেয়ার করবেন। এভাবেই তিনি বড় সাংবাদিক হয়ে উঠবেন। তথ্য পাওয়ার জায়গাগুলোতে বেশি যাতায়াত, আড্ডা দেয়া, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ফোন করা একজন রিপোর্টারের ফরজ কাজ। অনেক পুরোনো প্রবাদ- সাংবাদিকের পায়ে লক্ষী। যতো চলাচল ততো তথ্য, ততো রিপোর্ট।

লেখাটিতে নিজের কিছু অভিজ্ঞতা বলার উদ্দেশ্য ডিজিটাল জুগের নতুন সাংবাদিকরা যেন পেশার প্রতি যত্নবান হন। কারণ পেশাটি গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যম এখনও রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। এর প্রয়োজনীয়তা এখনও ফুরিয়ে যায়নি।

লেখক: হেড অব নিউজ, সংবাদ

‘সংবাদ’ একটি জাতির জন্মসারথি

মোহাম্মাদ নেসার

খবরের কাগজ বা পত্রিকা কি কেবলই কাগজ? নাকি কখনো কখনো তা হয়ে ওঠে একটি জাতির জন্মসনদ? কালির আঁচড় কি কেবলই খবর? নাকি তা কখনো কখনো বারুদের চেয়েও শক্তিশালী? ৭৫ বছর। একটি মানুষের প্রায় জীবনের সমান সময়। কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য এ যেন মহাকালের এক অবিরাম যাত্রা। ১৯৫১ থেকে ২০২৬ এই দীর্ঘ পথচলায় পদ্মা-মেঘনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। মানচিত্র বদলেছে, পতাকা বদলেছে, শাসকের গদি উল্টে গেছে বারবার। কিন্তু বদলায়নি একটি নাম। বদলায়নি একটি আদর্শ। সেই নাম ‘সংবাদ’।

জন্ম ও রূপান্তর (১৯৫১-১৯৫৪)

১৭ মে ১৯৫১। পুরান ঢাকার ২৬৩ বংশাল রোড। রোটারি মেশিনের খটখট শব্দে জানান দিল নতুন এক আগন্তুক। গিয়াসউদ্দিন আহমেদের হাত ধরে জন্ম নিল ‘সংবাদ’। প্রথম সম্পাদক খায়রুল কবির। শুরুতে হয়তো লক্ষ্য ছিল ভিন্ন। মুসলিম লীগ ঘরানার মোড়কে এর জন্ম। কিন্তু ইতিহাসের কি বিচিত্র খেলা। ১৯৫৪ সাল। জনমানুষের যুক্তফ্রন্টের জোয়ারে ভেসে গেল মুসলিম লীগ। আর ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে, ‘সংবাদ’ পেল তার প্রকৃত নাবিককে। দৃশ্যপটে এলেন আহমেদুল কবির। একজন ধনাঢ্য শিল্পপতি, কিন্তু হৃদয়ে প্রগতিশীলতার আগুন। তিনি কেবল মালিকানা বদল করলেন না, বদল করে দিলেন পত্রিকাটির আত্মা। তিনি ‘সংবাদ’কে মুক্ত করলেন সাম্প্রদায়িকতার শৃঙ্খল থেকে। ঘোষণা দিলেন এই পত্রিকা হবে মেহনতি মানুষের, এই পত্রিকা হবে বাঙালির স্বাধিকারের। সেই থেকে ‘সংবাদ’ আর কেবল খবর ছাপার কাগজ রইল না; হয়ে উঠল প্রগতিশীল রাজনীতির এক অঘোষিত পাঠশালা।

সাংবাদিক তৈরির বিশ্ববিদ্যালয়

‘সংবাদ’-এর নিউজরুম। সে এক জাদুকরী স্থান। এখানে কেবল খবর লেখা হতো না, এখানে তৈরি হতো দর্শন। টেবিলের একপাশে বসে আছেন জহুর হোসেন চৌধুরী, যার কলম থেকে বের হচ্ছে ‘দরবার-ই-জহুর’। কী তীক্ষ্ণ রসবোধ! কী সাহসিকতা!

অন্য টেবিলে হয়তো গভীর মনোযোগে কাজ করছেন সত্যেন সেন কিংবা রণেশ দাশগুপ্ত। মার্কসবাদী চেতনার এই ঋষিরা সাংবাদিকতাকে নিয়ে গিয়েছিলেন

শিল্পের পর্যায়ে। আর ছিলেন সন্তোষ গুপ্ত। যার ছদ্মনাম ছিল ‘অনিকেত’। যিনি আমৃত্যু লিখে গেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। শহীদুল্লা কায়সার, ফয়েজ আহমদ, কিংবা কবি হাবীবুর রহমান কে ছিলেন না এখানে? আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যাঁদের

সাংবাদিকতার আইকন বলি তাদের অনেকেই কোনো না কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন ‘সংবাদ’-এর সঙ্গে। তাদের ধমনীতে মিশে আছে ‘সংবাদ’-এর শিক্ষা। তাই তো বলা হয়, ‘সংবাদ’ হলো বাংলাদেশে সাংবাদিক তৈরির পাঠশালা।

এখান থেকেই তৈরি হয়েছে লড়াকু সাংবাদিকতা, এখান থেকেই শেখানো হয়েছে কীভাবে মেরুদণ্ড সোজা রেখে সত্য বলতে হয়।

সমাজ পরিবর্তনের অগ্রদূত

রাজনীতির বাইরেও ‘সংবাদ’ ছিল এক ধাপ এগিয়ে। ১৯৫৫ সাল।

যখন নারীদের কথা ভাবার মতো কেউ ছিল না, তখন লায়লা সামাদের সম্পাদনায় ‘সংবাদ’ চালু করলো ‘মহিলা পাতা’। নারীরা পেল তাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর। আর শিশুরা? তাদের জন্য এলো ‘খেলাঘর’। হাবীবুর রহমানের হাত ধরে যে খেলাঘরের যাত্রা শুরু, তা কেবল একটি পাতা ছিল না; তা হয়ে উঠল একটি আন্দোলন। আগামীর প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক ও অসাম্প্রদায়িক হিসেবে গড়ে তোলার এক কারিগর। সাহিত্য পাতায় শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হকদের আড্ডা এ যেন

ছিল বাঙালি সংস্কৃতির এক জীবন্ত চত্বর।

আগুনের দিনলিপি (১৯৬৬-১৯৭১)

ষাট দশক। উত্তাল বাংলা। ১৯৬২’র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬’র ৬ দফা। বঙ্গবন্ধু যখন বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা ঘোষণা করলেন, তখন অনেকেই দ্বিধায় ছিলেন।

কিন্তু ‘সংবাদ’ দ্বিধা করেনি। পাকিস্তানি জান্তার সব ভীতি উপেক্ষা করে ‘সংবাদ’ দাঁড়িয়েছিল ৬ দফার পক্ষে। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার ‘ইত্তেফাক’ আর আহমেদুল কবিরের ‘সংবাদ’ হয়ে উঠেছিল বাঙালির দুই চোখ। তারপর এলো ১৯৭১। সেই কালরাত। ২৫ মার্চ। পাকিস্তানি হায়েনাদের অপারেশন সার্চলাইট। তাদের হিটলিস্টের একেবারে উপরের দিকে ছিল ‘সংবাদ’। মধ্যরাতে বংশাল রোডের অফিসে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। সেই আগুন শুধু কাগজ পোড়ালো না, পুড়িয়ে ছাই করে দিল ১৯৫১ সাল থেকে জমানো অমূল্য সব আর্কাইভ। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো রোটারি মেশিন। আর সেই আগুনের ভেতরে, ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়ে অঙ্গার হলেন এক কলমযোদ্ধা শহীদ সাবের। তিনি হয়তো স্বপ্নে দেখছিলেন একটি স্বাধীন দেশের। তার সেই স্বপ্ন আর শরীর মিশে গেল ‘সংবাদ’ কার্যালয়ের ছাইয়ের সাথে। দীর্ঘ ৯ মাস পত্রিকা বন্ধ। কিন্তু চেতনা? তাকে কি পোড়ানো যায়?

ফিনিক্স পাখির মতো উত্থান ও গণতন্ত্রের লড়াই

১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারি। স্বাধীন বাংলাদেশ। ধ্বংসস্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো আবার ডানা মেললো ‘সংবাদ’। কিন্তু লড়াই কি শেষ হলো? ১৯৭৫, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা। সংবিধান কাঁটাছেঁড়া। সামরিক বুটের নিচে পিষ্ট গণতন্ত্র। জিয়ার আমল, এরপর এরশাদের স্বৈরাচার। যখন অনেকেই আপোষ করেছিল, ‘সংবাদ’ তখনো মাথা নোয়ায়নি। সন্তোষ গুপ্তের ‘অনিকেত’ কলাম হয়ে উঠল স্বৈরাচার বিরোধীদের অক্সিজেন। নব্বইয়ের গণআন্দোলনে নূর হোসেনদের মিছিলে ‘সংবাদ’ ছিল সহযোদ্ধা। মানিক চন্দ্র সাহার মতো সাংবাদিকরা জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন ‘সংবাদ’ আপোষ করতে জানে না।

বর্তমান ও আগামীর পথে

আজ ২০২৬ সাল। বংশাল রোড থেকে ৩৬ পুরানা পল্টন। ৭৫ বছরের এক দীর্ঘ পথপরিক্রমা। আজ প্রযুক্তির যুগ। কাগজের ঘ্রাণ ছাপিয়ে মানুষ এখন স্মার্টফোনের স্ক্রিনে খবর পড়ে। ‘সংবাদ’ কি পিছিয়ে আছে? না। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এই ঐতিহ্যবাহী পত্রিকাটি আজ ডিজিটাল দুনিয়ায় পা রেখেছে। ছাপানো দৈনিকের পাশাপাশি ‘সংবাদ’ তার অনলাইন পোর্টালে ধরে রেখেছে সেই পুরনো

বিশ্বাসযোগ্যতা। আজ যখন ফেইক নিউজ, অপতথ্য আর গুজবের ভিড়ে তথ্য বা সত্য হারিয়ে যেতে চায়, তখনো মানুষ ‘সংবাদ’-এর ওপর আস্থা রাখে। কারণ তারা জানে, এই পত্রিকার প্রতিটি শব্দের পেছনে আছে ৭৫ বছরের সততার ইতিহাস।

অনন্ত নক্ষত্রবীথি

‘সংবাদ’ শুধু একটি পত্রিকা নয়। এটি বাংলাদেশের বেড়ে ওঠার সাথী। এর পাতায় পাতায় লেগে আছে ভাষা আন্দোলনের ঘাম, মুক্তিযুদ্ধের রক্ত, মানুষের অধিকার আর গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘশ্বাস। আজকের এই ডিজিটাল যুগে দাঁড়িয়ে, যখন আমরা ‘নেক্সরা’ বা এআই

প্রযুক্তির কথা বলি, তখনো আমাদের ফিরে তাকাতে হয় সেই বাতিঘরের দিকে। কারণ, শেকড় ভুলে কোনো গাছ মহীরুহ হতে পারে না। প্রতিটি ক্রান্তিকালে ‘সংবাদ’ ছিল, আছে এবং থাকবে। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন সত্যের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে বেঁচে থাকবে ‘সংবাদ’।

লেখক : ডিজিটাল মিডিয়া ডেভেলপমেন্ট এডিটর, সংবাদ

সংবাদ ও সংবাদপত্র

আবু জাফর শামসুদ্দিন

(পঁচিশ বছর পূর্তি সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রণ)

'তুমি যে সব কথা বলছ তার কোনোটাই আমি সমর্থন করি না, কিন্তু তোমার বলার অধিকার রক্ষার জন্যে আমি মরণপণ সংগ্রাম করতে রাজী'। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি মনীষী ভলতেয়ার নাকি এক উক্তির জনক। এই সেকেলে রোমান্টিক ভাবধারায় যাঁরা এখনও প্রকৃতই বিশ্বাসী, সেইসব সরলপ্রাণ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে প্রায়ই ভলতেয়ারের এই বাণীটি ব্যবহার করে থাকেন। তাঁরা বোধ করি ভেবে দেখেন না যে, যদৃচ্ছা মত প্রকাশের পরিপূরক-রূপে যদৃচ্ছা কর্ম করার স্বাধীনতাও যদি থাকতো তাহলে আর যাই ঘটুক সুসংবদ্ধ সমাজরূপে মানজাতির প্রতিষ্ঠা লাভ কখনো সম্ভব হতো না। সুতরাং ভলতেয়ার উচ্চারিত বাণীর সঙ্গে পুরোপুরি একমত হওয়া বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তাই বলে মানুষ গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী নয়। ন্যায় ও কল্যাণের ভিত্তিতে বিধিবদ্ধ সমাজই গণতন্ত্র। আমরা সকলেই সে রকমের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষও তাতে বিশ্বাসী। স্বাধীনভাবে চিন্তা করা এবং চিন্তা প্রকাশ করার অধিকার যে সমাজে স্বীকৃত সাধারণ অর্থে সেটাই গণতান্ত্রিক সমাজ।

একমাত্র শর্ত-চিন্তা যতই মৌলিক হোক তার উদ্দেশ্য সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ হতে পারে। মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলাকে পরম পবিত্র জ্ঞান করে অনরাজ্যের কাব্য রচনা করলেও তা কখনো সমাজবদ্ধ মানুষের চিন্তার লক্ষ্য হতে পারে না। বলা বাহুল্য, বৃহত্তর কল্যাণ বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণ বোঝায়। রুশোর কবিতার ন্যায় অবাধ-নীতিও (Laissez faire) ব্যক্তিক স্বাধীনতার রোমান্টিক ধারণা-প্রসূত উৎক্ষেপ। এ নীতি প্রবক্তাদের কল্যাণ সাধন করেছে সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই সঙ্গে পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মানসিক এবং দৈহিক যন্ত্রণা ও দুর্দশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিও করেছে।

সংবাদপত্ররূপে দৈনিক সংবাদ জন্মের পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কিছু লিখতে গিয়ে কেন এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার অবারণা তার ব্যাখ্যা বোধ করি আবশ্যক। দৈনিক সংবাদের প্রতিষ্ঠা অথবা তার কর্মরত সাংবাদিকরূপে পত্রিকাটির সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র কখনো ছিল না এবং এখনও নেই। কিন্তু অন্য রকমের একটি যোগসূত্র বরাবর আছে। অবিভক্ত বাংলাদেশের তৎকালীন রাজধানী কলকাতায় যাদের সঙ্গে নানা কর্মব্যপদেশে, ফল্গুধারার ন্যায় একটি আত্মিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল, সংবাদের প্রতিষ্ঠা এবং তৎপরবর্তী কর্মরত সাংবাদিকরূপে তাঁদের কেউ কেউ পত্রিকাটির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁদের সকলে জীবিত নেই। জীবিতদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও সংবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন। সংবাদের মালিকানা একাধিকবার বদল হলেও তাদের সকলের স্থানচ্যুতি ঘটেনি। সংবাদের সঙ্গে আমার যোগসূত্রের সেতু রোমান্টিক যৌবনের সেই বন্ধুরা এখনও যাদের বাক্যালাপ-বন্ধ, হৃদ্যতা, সহমর্মিতা আমাকে আনন্দ দেয়। বলা বাহুল্য, জীবনের সায়াহ্নকালে বন্ধুর সংখ্যাও হ্রাস পায়।

সংবাদের প্রতিষ্ঠা এবং তার মালিকানা হস্তান্তরিত হওয়ার ইতিহাস অনেকেই অবগত আছেন। আমি তার পুনরাবৃত্তি করব না। নামকরণের সময়ে প্রথম সম্পাদক খায়রুল কবির বলেছিলেন সম্পাদকীয় অর্থাৎ পরিচালকদের মতামত যাই হোক, যা প্রকৃতই সংবাদ, সংবাদ তা প্রকাশ করবে। সেটা ছিল মুসলিম লীগ শাসনকাল। সংবাদ ছিল মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার কাগজ এবং মুসলিম লীগের লোকেরাই তার ব্যয়ভার বহন করতো। সেকালেও দেখেছি যা প্রকৃতই সংবাদ, অলঙ্কারবর্জিতভাবে হলেও সংবাদের সম্পাদকমণ্ডলী তা যথাসাধ্য প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। তারপর দেশে বারবার রাজনৈতিক উত্থান-পতন ঘটেছে। ১৯৭১ সালের শেষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে গেছি। রাজনৈতিক সংঘাতে পড়ে সংবাদ কখনো কখনো বন্ধ হয়েছে। ইয়াহইয়ার বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক সংবাদের বাড়িঘর ভস্মীভূতও হয়েছে, তরুণ কবি শহীদ সাবের সংবাদ অফিসেই ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ আগুনে পুড়ে শহীদ হন।

এখনও সে ঘটনার ভয়াবহ স্মৃতি মন থেকে অপসারিত করতে পারি না। এই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও সংবাদ তার প্রতিষ্ঠাকালীন ঐ লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হয়নি। প্রকৃতই যা সংবাদ-সংবাদের নামে নিবন্ধন-তা অপ্রিয় হলেও প্রকাশ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

এ যুগের সংবাদপত্রে সংবাদ ছাড়াও আরো বহু বিষয় থাকে। মালিক এবং তার স্বজাতীয়দের মতামত সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় "মূল্য" বৃদ্ধি করে। অন্যত্রও ভাষ্য এবং তথ্যের আকারে তা স্থান পায়। দৈনিক সংবাদপত্র এ যুগে মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও পালন করছে। বাংলাদেশে বিশেষভাবেই করছে। সে জন্যে বিশেষ পৃষ্ঠা বরাদ্দ আছে। সজাগ মালিক সে-সব পৃষ্ঠায়ও যাতে তার এবং তার স্বগোত্রীয়দের মতামত স্থান পায় তজ্জন্য বাছাই করা লেখক নিয়োগ করেন। সত্য বলেই, দুঃখের সাথে হলেও বলতে হচ্ছে, পাকিস্তানের জন্মকাল হতে বাংলাদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে তার আঞ্চলিক অবলুপ্তির দিন পর্যন্ত ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের প্রায় সকল সংবাদপত্র সাধারণ পাঠকের মনে ক্রাউড সেন্টিমেন্ট (Crowd sentiment) জনতা সুলভ ভাবাবেগ সৃষ্টি করার এবং দেশের লোকের মধ্যে জ্ঞানালোক বিতরণের নামে ব্যাপকভাবে মূর্খতা সম্প্রসারণের সজ্ঞান প্রচেষ্টা চালিয়েছে। স্বাধীন জাতিসুলভ বিচার-বুদ্ধি জাগ্রত করার কোনরূপ চেষ্টা করেনি। বিগত ঊনত্রিশ বৎসর মধ্যে কয়েকবার বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভব এবং অবশেষে ১৯৭১ সালের শেষে প্রকৃতই বিপ্লব হয়ে গেলো। বলা বাহুল্য, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পরাধীন দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনকে আমি বিপ্লব মনে করি। এসব ঘটনার পরও জনগণের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত যেসব সংবাদপত্র উপরোক্ত ঘটনাবলীর হেতুমূলে না গিয়ে জনমনের হতাশাকে অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করে দেশের লোককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে-এমনকি পরোক্ষভাবে 'ফের শুরু হতে শুরু করার' প্রেরণা যোগাচ্ছে, তাদের নীতিকে গণবিমুখতা বললে বড় জিনিসকে অত্যন্ত ছোট করা হয়। কিন্তু তা হলেও কটুক্তি করতে তো পারি না।

দৈনিক সংবাদ পত্রিকাটিকে আমি এই স্বার্থান্ধ গতানুগতিকার ব্যতিক্রমরূপে চিহ্নিত করতে চাই। সে সাধারণ মানুষকে অনর্থক ভাবাবেগে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত জনতায় (Crude) পরিণত করতে চায় না, করতে চায় না পশ্চাম্মুখী। সে পাঠক সমাজকে, বিদ্যমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতার মধ্যে যতটুকু সম্ভব, বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন সুস্থ-সবল জীবনবাদী নাগরিকরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে বলে আমার ধারণা। উল্লেখ্য যে, বিচারবুদ্ধিই প্রকৃত মুক্তচিন্তার উৎস এবং গণতন্ত্রেরও উৎস। বলা বাহুল্য, স্বাধীন দেশকে বাঞ্ছিত পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এটাই একমাত্র পথ। বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকই শুধু ঘটনাসমূহের হেতু নির্ণয় এবং ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তাঁরাই করতে পারেন সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণ। একথা কি বলার আশ্যকতা আছে যে, ইতিহাসের হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটে না।

সুতরাং অতীত কখনো বর্তমান সমস্যাবলীর সমাধান করতে পারে না, কেননা মানব সমাজের প্রত্যেকটি পরবর্তী ধাপ পূর্ববর্তী ধাপের সাথে সামঞ্জস্যহীন। ঐ রকম অস্বাভাবিক কিছু ঘটাতে চাইলে, কার্ল মার্কসের কথায়, তা ট্র্যাজেডি অথবা ফার্স (প্রহসন) পরিণত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স এখনও ছ' বৎসর পূর্ণ হয়নি।

জাতির ভাগ্য এত অল্পকাল মধ্যে নির্ণিত হয় না কেননা প্রতিভা বিকশিত হতে সময় লাগে, প্রতিভা মৌসুমি ফুল নয়। যাঁরা এই অল্প সময়ের ব্যর্থতাকে চরম ব্যর্থতারূপে চিহ্নিত করে পুনরায় পরাধীনতাকালীন অবাধ-নীতিতে (Laissez faire), অন্য কথায় (Free for the few)-এর অনরাজ্যে ফিরে যাওয়ার সুপারিশ সজ্ঞানে করছেন তাঁরা প্রকারান্তরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই অস্বীকার করছেন, কেননা এটা প্রমাণিত সত্য যে, দু দু মিঞার যুগ হতে শুরু করে অদ্যাবধি বাংলাদেশে যত গণসংগ্রাম হয়েছে, যে নামেই পরিচিত হোক, তার প্রত্যেকটির পশ্চাতে রয়েছে অর্থনৈতিক পীড়ন হতে মুক্তির অভিলাষ। অবাধ-নীতি বাংলাদেশের ন্যায় ঘনজনবহুল দেশের সমস্যা কখনো সমাধান করতে পারে না। পক্ষান্তরে অবাধ-নীতির সম্পূরক অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা একটি অন্যটির লজিকাল পরিণতি। অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতার সুযোগ যেখানে অনুপস্থিত তার বাঞ্চনীয় মনে করা হয় না, সেখানে অবাধ-নীতি প্রকৃত পক্ষে অবাধ শোষণ-নীতি। দেশের মানুষ রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সারপদার্থহীন নিছক ধ্বনি জ্ঞান করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে বাস্তবজীবনে সর্বপ্রকার কল্যাণের পূর্বশর্ত এবং তা বাস্তবায়নের মন্ত্ররূপে ধরে নিয়ে জ্ঞান ও মান বিসর্জন দিয়েছে। বিপদের সময়ে উভয় দিক রক্ষা করার কৌটিল্যিক কৌশল তারা জানে না। তারা সরল বিশ্বাসে আত্মদান করেছে। তবু কেন বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা? যদ্দিন সম্ভব ব্যক্তিগত এবং স্বগোত্রীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণ ও পরিবৃদ্ধির সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যেই কি? অতঃপর "After me the delnge" আমার পরে পৃথিবীর রসাতলে যাক।

দার্শনিক হলভোর্টিয়াস বলেছেন, অজ্ঞানতা এবং নির্বুদ্ধিতা (Ignorance and stupidity) এক বস্তু নয়। মানুষ অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে জন্মায়। শিক্ষা তাকে নির্বোধ বানায়। যে শিক্ষা মূর্খতা সম্প্রসারণের সহায়ক হলভোর্টিয়াস ঐ প্রকার শিক্ষার নিন্দা করেছেন বলেই মনে হয়। আমাদের দেশে বিগত ঊনত্রিশ বৎসর ধরে কখনো বাংলা ভাষাকে ইস্যু করে, কখনো বাংলা ভাষার মহত্তম কবি রবীন্দ্রনাথকে ছোট করার চেষ্টা করে, কখনো বা কবি কাজী নজরুল ইসলামকে খণ্ডিত এবং তাঁর কাব্য সংশোধন করার অপচেষ্টা চালিয়ে, কখনো ইহলৌকিক স্বার্থে পবিত্র ধর্মকে পণ্যরূপে ব্যবহার করে, হলভোর্টিয়াসের কথায়, শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে নির্বোধ করার প্রয়াস চলছে। এককালে সাংবাদিক ছিলাম। তা সত্ত্বেও অসংকোচে বলছি, দেশের এক শ্রেণীর সংবাদপত্র এই কুশিক্ষার হাতিয়াররূপে কাজ করেছে। মূর্খতা সম্প্রসারণ দ্বারা শ্রেণী-স্বার্থ সংরক্ষণ ও সহায়-সম্পত্তি পরিবৃদ্ধির এ অপচেষ্টায় দৈনিক সংবাদ কখনো স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে যোগদান করেছে বলে মনে পড়ছে না। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বাধ্যবাধকতা মিটিয়ে সংবাদ যতটা সম্ভব যুক্তিসিদ্ধ-মুক্তবুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক সুলভ অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমার মতে দৈনিক সংবাদের এটাই বিশেষত্ব। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও সংবাদ তার এই চারিত্রিক বিশেষত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও বাঁচিয়ে রাখবে এ আশা রাখি।

লেখক : সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক

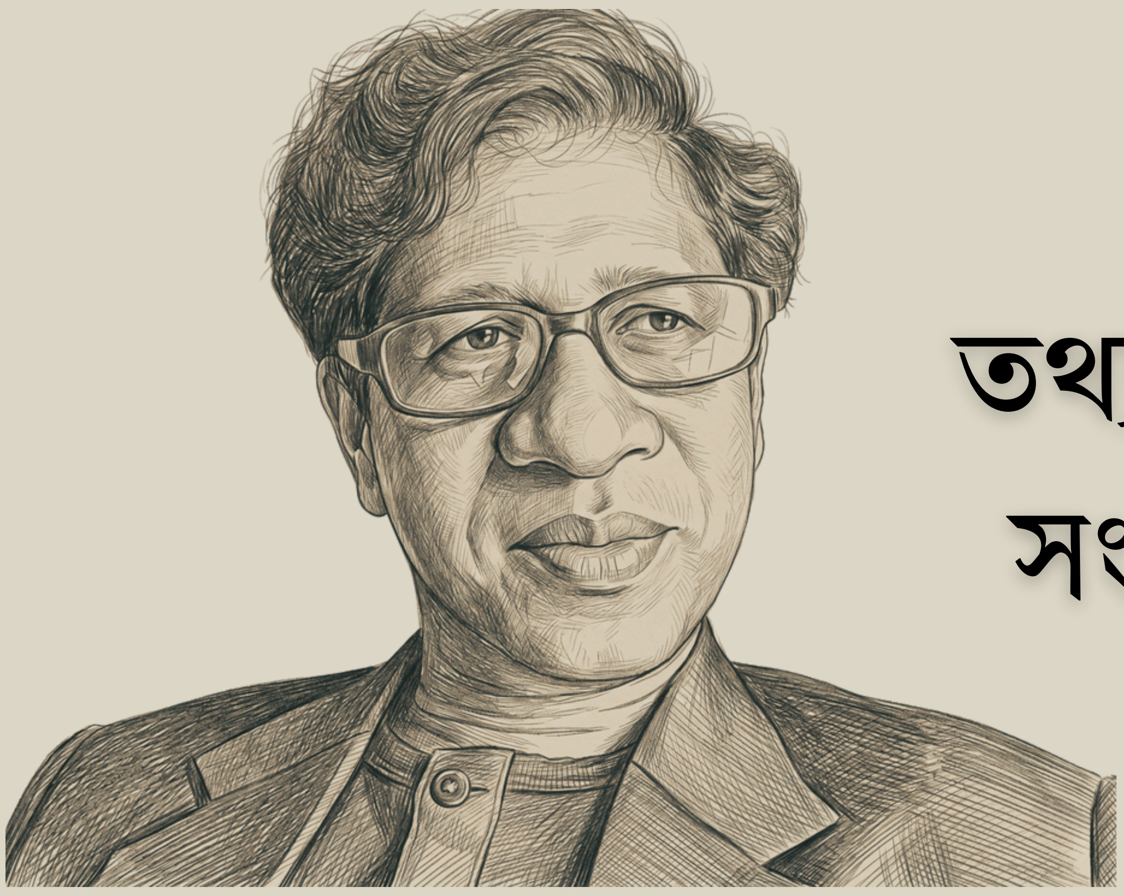

তথ্য-জ্ঞান বিস্ফোরণে সংবাদমাধ্যমের দায়

নিয়ন মতিয়ুল

দুই আড়াই দশক আগের কথা। জেলা শহরের এক পত্রিকা অফিসে গিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ শুনলাম। এক সিনিয়র তার জুনিয়রকে বলছেন, "যেসব নিউজ পাঠক 'খায়' না, সেগুলো লেখার দরকার নেই।" চমকে গিয়ে সবিনয়ে বিষয়টা জানতে চাইলাম। সেদিন বুঝেছিলাম, নিউজ 'খাওয়া' শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহার হয়। যা বুঝায়, নিউজ একটা পণ্য আর পাঠক হচ্ছেন কনজিউমার বা ভোক্তা। আরও বুঝলাম, যে পত্রিকার ভোক্তা যত বেশি, সেই পত্রিকা তত বেশি জনপ্রিয়। আর জনপ্রিয়তা বাড়লে বিজ্ঞাপন বাড়ে। সঙ্গে পত্রিকার মুনাফাও বেড়ে যায়।

বিগত শতকের সেই 'খবরপণ্যের' বিবর্তন ঘটে গেল ইন্টারনেট আবিষ্কারের পর। আগে পাঠকের কাছে খবর পৌঁছে যেত কাগজে করে ছাপার অক্ষরের মাধ্যমে। আর চলতি শতকের গোড়ার দিকে ইন্টারনেট হয়ে উঠলো খবরের মানচিত্রহীন বাহক। যাত্রা শুরু হলো ইন্টারনেটভিত্তিক (ডিজিটাল) পত্রিকা বা নিউজপোর্টালের। প্রায় একই সঙ্গে ইন্টারনেটের পরিসরে ভেসে এলো ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারের মতো জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো।

ফলে পুরোনো সেই 'খবর' বা 'নিউজের' চেহারা গেল বদলে। শুধুই অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ইন্টারনেট পরিসরে লেখা, ছবি, অডিও বা ভিডিওর আকারে তথ্য হয়ে উঠল খবরের উপকরণ। যে উপকরণের ডিজিটাল ভার্সনের ভিন্ন একটা নাম দেওয়া জরুরি হয়ে পড়লো।

মার্কিন গবেষক, মিডিয়া ও কালচারাল স্টাডিজের অধ্যাপক কেট আইখর্ন ২০২২ সালে 'কনটেন্ট' নামে বই প্রকাশ করলেন। যেখানে বললেন, ২০০০ সালের দিকে ইন্টারনেটের গতি বেড়ে যাওয়া, সোশ্যাল মিডিয়ার উত্থান, গুগল অ্যাডসেন্স চালু হওয়ার প্রেক্ষাপটে 'খবর', 'ভিডিও', 'ছবি' সবকিছুর জন্য নিরপেক্ষ ও গুণগত বিচারহীন শব্দের দরকার পড়েছিল। পুরোনো 'নিউজ' বা 'প্রোগ্রাম' শব্দগুলো সংকীর্ণ মনে হওয়ায় 'কন্টেন্ট' শব্দটি তখন দ্রুত জায়গা করে নেয়।

ফলে আগের 'নিউজ পড়া' এসে ঠেকলো 'কন্টেন্ট কনজিউম' শব্দে। 'পাঠক' পরিণত হলেন 'অডিয়েন্স' বা 'ইউজারে'। গুগল অ্যাডসেন্সের বদৌলতে হাজির হলো 'হিট', 'ভিউ', 'ট্রাফিক' শব্দগুলো। আগের দিনের 'খবর' ছিল যাচাই করা সত্যতথ্য। অথচ এ যুগে একটা ছবিও 'কনটেন্ট'। কেট আইখর্নের ভাষায়, 'কন্টেন্ট' মানে 'শুধু ছড়ানোর জন্যই ছড়ানো উপাদান'। যেমন- একটা ভাইরাল ছবি, যার ভেতরে কোনো জ্ঞান বা তথ্য নেই। অথচ কোটি কোটি মানুষ দেখছে।

প্রখ্যাত মিডিয়া সমালোচক মার্কিন সাংবাদিক জে রোজেন বলেন, "অডিয়েন্স আর প্যাসিভ নেই। সে এখন সক্রিয়। শেয়ার করে, কমেন্ট করে, নিজেও তৈরি করে। সংবাদমাধ্যম এখন শুধু অন্য খবরের সঙ্গে নয়, প্রতিযোগিতা করছে প্রতিটি ডিজিটাল উপাদানের সঙ্গে। ফলে শুধুই 'ভিউ' বা 'ট্রাফিক' নয়, প্রয়োজন 'বিশ্বাস' ও 'সম্পর্ক' গড়ে তোলা।"

সাংবাদিক জে রোজেনের এই 'বিশ্বাস' আর 'সম্পর্ক' গড়ে তোলাই হচ্ছে ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বিষয়টা বুঝতে গেলে তথ্য আর জ্ঞানের 'মহাবিস্ফোরণের' তত্ত্বের দিকে তাকাতে হবে।

গত কয়েক দশক ধরে ব্যাপক আলোচিত একটা শব্দ হচ্ছে, 'তথ্যের মহাসমুদ্র'। বলা হচ্ছে, প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীতে কোটি কোটি তথ্য উৎপাদিত হচ্ছে। আর আমরা তথ্যের মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি। এতে প্রশ্ন এসে যায়, তথ্য ব্যবহার করে প্রতিদিন যে 'খবর' বা 'কনটেন্ট' তৈরি হচ্ছে তার পরিমাণ আসলে কত?

ক্লাউড ডেটা প্ল্যাটফর্ম ডোমোর ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন 'ডাটা নেভার স্লিপস ১০.০' অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী প্রতি মিনিটে ১ কোটি ৬০ লাখ টেক্সট বার্তা বা খবর আদান-প্রদান হয়। প্রতি মিনিটে ইউটিউবে আপলোড হয় ৫০০ ঘণ্টা নতুন ভিডিও কনটেন্ট। ব্যবহারকারীরা প্রতি মিনিটে দেখেন ১০ লাখ ঘণ্টা অনলাইন ভিডিও।

কিছু গবেষণা বলছে, প্রতি সেকেন্ডে তিনশর বেশি খবর মূলধারার গণমাধ্যমে তৈরি হয়। প্রতি মিনিটে কেবল ফেসবুকেই পোস্ট হয় প্রায় ২৪ লাখ স্ট্যাটাস। টুইটারে চার লাখের বেশি টুইট যুক্ত হয়। প্রতি ঘণ্টায় কয়েক লাখ ভিডিও আপলোড হচ্ছে শুধু ইউটিউবে। যে হিসাবের মধ্যে আছে টিকটক, এক্স, হোয়াটসঅ্যাপ, লিংকডইনসহ বহু প্ল্যাটফর্ম। এআই আর অনলাইনের কারণে এই সংখ্যা প্রতিমুহূর্তে বাড়ছে। আর এসব তথ্যের মধ্য থেকেই একাংশ আমাদের সামনে আসে 'খবর' হয়ে।

যদিও এসব বিষয়ে তেমন গবেষণা নেই। তবে মার্কিন উদ্ভাবক, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বাকমিনস্টার ফুলারের 'জ্ঞানবিস্ফোরণ' তত্ত্ব তথ্যের সুনামির দিক উন্মোচন করে দেয়। তিনি দেখিয়েছেন, ১৯০০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর অর্জিত মোট জ্ঞান দ্বিগুণ হতে সময় লাগতো ১০০ বছর। ১৯৪৫ সালের দিকে এসে তা নেমে আসে ২৫ বছরে। ফুলারের তত্ত্ব প্রকাশকালে (১৯৮২) সেই সময়ে এসে ঠেকে প্রায় এক বছরে।

তার তত্ত্বের ওপর ভিত্তিতে পরে আইবিএম দেখায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর আধুনিক ডেটা বিস্ফোরণের ফলে ২০২০ সালের পর মানবজাতির তথ্য ও জ্ঞান প্রতি ১২ ঘণ্টায় বা একদিনে দ্বিগুণ হচ্ছে। অনেক গবেষকের মতে, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জিনতত্ত্ব বা এআই গবেষণার মতো কিছু ক্ষেত্রে এই সময় নেমে এসেছে আরও সংক্ষিপ্ত হয়ে। বলা হচ্ছে, এক কাপ চা খেতে খেতে পৃথিবীর সব আবিষ্কৃত জ্ঞান আগের চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে।

ফুলারের তত্ত্ব অনুযায়ী, তথ্য-জ্ঞান বিস্ফোরণ আমাদের মস্তিষ্কের ওপর প্রতিমুহূর্তে সুনামির ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে। অর্থাৎ আমাদের মস্তিষ্ক হাজার বছর আগের। অথচ আমরা বসে আছি তথ্যের মেশিনগানের সামনে। এক্ষেত্রে তাই প্রশ্ন, প্রাচীন মানবমস্তিষ্ক কতটা সক্ষম তথ্য-জ্ঞানের এমন বিস্ফোরণ সামাল দিতে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিবর্তনের ধারায় মানুষের মস্তিষ্ক লাখ লাখ বছর ধরে গড়ে উঠেছে ধীর, স্থির, নির্ভরযোগ্য পরিবেশের জন্য। যে সময়ে তথ্য আসতো ধীরে, মুখে মুখে, গল্পে গল্পে, পুঁথির পাতায় পাতায়। তখন মস্তিষ্কের কাজ ছিল শুধু তথ্য যাচাই, গভীরভাবে প্রক্রিয়াজাত, আবেগের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া আর দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা। এআই-জেনারেটেড তথ্যের বিষয় তখন কল্পনারও বাইরে ছিল।

বিখ্যাত নিউরন জার্নালে ২০২৪ সালে প্রকাশিত মার্কিন নিউরোবায়োলজিস্ট মার্কাস মাইস্টার ও গবেষক জিয়েউ ঝেং-এর যুগান্তকারী গবেষণায় দেখানো হলো, “মানুষের চিন্তার গতি সর্বোচ্চ ১০ বিট (কম্পিউটার তথ্যের ছোট একক) প্রতি সেকেন্ড।”অর্থাৎ মানুষের মস্তিষ্ক প্রতি মুহূর্তে যে পরিমাণ তথ্য প্রক্রিয়াজাত করতে পারে, তার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে- যা ‘কগনিটিভ লোড ক্যাপাসিটি’। এই সীমা পেরোলেই মস্তিষ্ক কাজ করতে শুরু করে আপৎকালীন পদ্ধতিতে। অর্থাৎ যত বেশি তথ্য ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, তত কম ভাবছে মানুষ। প্রতিক্রিয়া বাড়ছে ঠিকই, তবে চিন্তা কমছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়টাকে আরও জটিল করে তুলছে। একটি এআই মডেল ভুলভাল, পক্ষপাতিত্ব আর কাল্পনিক মিলে এক সেকেন্ডে হাজার হাজার কনটেন্ট তৈরি করতে পারে। মানুষ সেই তথ্য পড়ছে, শেয়ার করছে, তার ওপর ভিত্তি করে রাগ করছে, আনন্দ করছে, ভয় পাচ্ছে। অথচ, আমাদের মস্তিষ্ক বিবর্তনের ধারায় এখনও সেই সক্ষমতা অর্জন করেনি, যেখানে সেকেন্ডের মধ্যে এআই-জেনারেটেড তথ্য আর মানুষের লেখার পার্থক্য বুঝে ফেলবে।

কারণ, বিবর্তনকে সময় দিতে হয়। অথচ সমস্যা হচ্ছে, বিবর্তনকে দেওয়ার মতো সময় সংবাদমাধ্যমের কাছে নেই। ফলে সাংবাদিক জে রোজেনের সেই ‘বিশ্বাস’ আর ‘সম্পর্ক’ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব এখন সীমাহীন। ফুলারের তথ্য-জ্ঞান বিস্ফোরণের এই যুগে মানুষের মধ্যে ‘লার্নড হেলপলেসনেস’ বা শিখে ফেলা অসহায়ত্ব হচ্ছে। এত তথ্য-জ্ঞান, এত এত সমস্যার পাহাড়, অথচ তার কিছুই করার নেই- এমন অনুভূতি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। ফলে সংবাদমাধ্যম যদি প্রতিমুহূর্তে শুধু সমস্যা নিয়ে চিৎকার দিতে থাকে তাহলে মানুষের মস্তিষ্ক আত্মরক্ষার জন্য তথ্যের সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে।

বিবর্তনের শিক্ষা হচ্ছে, বিপদের সময় মানুষের মধ্যে ‘ফাইট অর ফ্লাইট’ মুড সক্রিয় হয়। অর্থাৎ যুদ্ধ করে অথবা পলায়ন করে। তথ্যের সুনামিতে ‘পলায়ন’ অর্থ খবর না পড়া, সংবাদমাধ্যম থেকে দূরে সরে যাওয়া। আর ‘যুদ্ধ’ এখানে ক্ষোভ আর হতাশা। ফলে সংবাদমাধ্যমের কাজ হচ্ছে, তথ্যের সুনামি নয়, সমাধানের তথ্যও উপস্থাপন করা। সমাধানের পথ বা সফলতার দৃষ্টান্তগুলো মানুষের মস্তিষ্কে ‘প্রত্যাশার নিউরন’ সক্রিয় করে তোলে। যা বিবর্তন ধারায় মানুষের টিকে থাকার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

সংবাদমাধ্যমের তথ্যে ‘বিশ্বাস’ ফিরিয়ে আনতে নিউজরুমের পুরোনো ধারার গেটকিপিং পদ্ধতি আর কাজে আসছে না। সীমাহীন তথ্যসমুদ্রের মধ্যে টেকসই ‘লাইফবোট’ তৈরি করতে হবে। প্রতিটি কনটেন্টে ‘ভেরিফাইড ট্রাস্ট মার্ক’ যুক্ত করে দেওয়া জরুরি। যেখানে তথ্যের উৎস আর যাচাই করার প্রক্রিয়া যুক্ত থাকবে। কনটেন্ট এআই-জেনারেটেড হলে তা জানিয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি তথ্যের ‘ডোজ’ও নির্ধারণ করে দিতে হবে। গেটকিপারদের মনে রাখতে হবে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ‘ব্রেকিং নিউজ’ হজম করার জন্য মানবমস্তিষ্ক এখনও সক্ষম নয়। সমাধানভিত্তিক ও গঠনমূলক খবর থাকতে হবে।

নরওয়ের জাতীয় পাবলিক ব্রডকাস্টার ‘এনআরকে’ ২০০৯ সাল থেকে ‘ন্যাচারালি স্লো নিউজ’ ফরম্যাট চালু করেছে। সে বছর বার্গেন থেকে অসলো পর্যন্ত ৭ ঘণ্টার ট্রেন যাত্রা লাইভ দেখানোর মাধ্যমে সেই প্রবণতা শুরু হয়। যাতে এনআরকের পাঠক-ধারণের হার চল্লিশ শতাংশ বেড়েছে। নিউজরুমের আরেকটি অঙ্গীকার হলো ‘ডিজিটাল ওয়েলনেস’। শুধু খবর পরিবেশন নয়, খবর গ্রহণের সুস্থ পদ্ধতি জানানো, স্ক্রিন টাইম কমানোর টিপস দেওয়া, তথ্য ডিটক্সের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, গভীর পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা আর নিউজ ফাস্টিং-এর মতো বিষয়গুলো অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফিনল্যান্ডে গণমাধ্যমে ‘ফ্যাক্ট ফাস্ট’ হিসেবে সপ্তাহে অনন্ত একদিন কোনো সংবাদ পরিবেশন করা হয় না। মূলত, মস্তিষ্ক ধীরে হজম করতে পারে, গভীরভাবে বোঝার সুযোগ পায়- সেটাই ডিজিটাল খবরের ডিটক্স (বিষমুক্তকরণ)। যার মধ্য দিয়ে গণমাধ্যম স্বাস্থ্য সাক্ষরতা বাড়তে পারে।

অতিরিক্ত তথ্যের কারণে সঠিক তথ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠার বিষয়টি প্রথম ইনফোডেমিক’ শব্দ হিসেবে ২০২০ সালে মিউনিখের বৈশ্বিক সম্মেলনে জোরালোভাবে ব্যবহার করেন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড. টেড্রোস আধানম গেব্রেইয়েসুস। বর্তমানে ‘ইনফোডেমিক’ ছাড়িয়ে ‘জ্ঞান সুনামি’র মুখোমুখি মানবজাতি। এখন কেবল ভুল তথ্যই সমস্যা নয়, সঠিক জ্ঞানের পরিমাণও এত বেশি যে তা হজম করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।কারণ, আমাদের মস্তিষ্ক সেই প্রাচীন অ্যালগরিদমে ডিজাইন করা।

মানুষের জিনে পরিবর্তন আসতে লাগে হাজার হাজার বছর। অথচ সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে মাত্র কয়েক বছর বা দিনে। লাখ লাখ বছর আগের মস্তিষ্ককে সুরক্ষা দিতে সংবাদমাধ্যমকে ভিন্ন পথ খুঁজতে হবে। তথ্যের সুপারসনিক গতির সঙ্গে পাল্লা না দিয়ে বরং কঠোরভাবে মান যাচাই করতে হবে। তথ্য বা জ্ঞান তখনই সুখের হয়, যখন সেটা হজমযোগ্য, পুষ্টিকর হয়।

সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করা সময়োপযোগী তথ্য-জ্ঞান পাঠক-অডিয়েন্সের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়াই হবে ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমের কঠিন এক দায়িত্ব। যে দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যেতে চায় উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন সংবাদপ্রতিষ্ঠান ৭৬ বছরে পা দেওয়া ‘সংবাদ’ ডিজিটাল। মনে রাখতে হবে, যে মিডিয়া পাঠকের মস্তিষ্কের বিবর্তন বোঝে, তারা টিকে থাকে। বাকিরা হারিয়ে যায় তথ্যের মহাপ্লাবনে।

লেখক : নিউজ এডিটর, সংবাদ

সংবাদ বাংলাদেশে সাংবাদিকতার পথিকৃৎ

সালাম জুবায়ের

বাংলাদেশে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পথিকৃৎ দৈনিক সংবাদ এবছর ১৭ মে ৭৬ বছরে পা রাখছে। সংবাদের এই ৭৬ বছরে পা দেওয়া একটি গৌরবের প্রেক্ষাপট যেমন তৈরি করেছে তেমনি প্রতিদিন সংবাদ পাঠকদের সামনে বাংলাদেশকে তুলে ধরেছে। এ জন্য ৭৫ বছর পেরিয়ে ৭৬ বছরে পদার্পণ করা শুধু যারা পাঠক, যারা কর্মী এবং যারা সংবাদের কর্ণধার, শুধু তাদের জন্যই নয়, দেশের সাংবাদিক সমাজ এবং অসাম্প্রদায়িক, উদার গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল মানুষ সবার জন্যই একটি গৌরবের অধ্যায় তৈরি করেছে।

সংবাদ পথচলা শুরুর কিছুদিন পর থেকেই ছিল অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনার বাহক। যে কথাটি এক্ষেত্রে বলা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো, সংবাদ ও তার কর্ণধাররা সংবাদপত্র প্রকাশের নতুন ধ্যান-ধারণাকে শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, তা ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বব্যাপী। সংবাদ পরবর্তী সব সংবাদপত্র প্রকাশনাই একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত ছিল সংবাদের পথ অনুসরণকারী। অনেকেই পরে নতুন চেতনা যুক্ত করে সংবাদপত্র প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই শুরুর ভিত্তি তৈরি হয়েছিল সংবাদের আদর্শকে ধারণ করেই।

সংবাদের সবচেয়ে উজ্জ্বল সময়ের কর্ণধার ছিলেন আহমদুল কবির। তিনি সংবাদকে পূর্ব পাকিস্তানের, পরে বাংলাদেশের অবহেলিত মানুষের মুখপত্রে পরিণত করেছিলেন। এক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় পুঁজি ছিল উদার প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ। জমিদার পরিবার থেকে উঠে আসা এই কৃতী পুরুষ তার মালিকানাধীন সংবাদপত্রকে রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষিত গণমানুষের সংবাদপত্র হিসেবে দাঁড় করাতে যেভাবে ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন তা একটি আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে বাংলাদেশের সংবাদপত্র শিল্পে।

আমরা সাধারণভাবে কোনো সভায় বা সেমিনারে সংবাদপত্র সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করি তখন প্রায়ই বলি সংবাদপত্র হচ্ছে সমাজের দর্পণ। আমাদের চারপাশে প্রতিদিন যা কিছু ঘটে তার প্রতিফলন দেখা যায় সংবাদপত্রে। সংবাদপত্রকে আবার সহজ ভাষায় বলি 'খবরের কাগজ' অর্থাৎ যেখানে শুধু খবর নিয়েই সব কর্মকাণ্ড। এ কথাকে বাস্তবে প্রমাণ করেছে দীর্ঘকাল ধরে এই বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রকাশিত সব সংবাদপত্রই। দৈনিক সংবাদ সেই শুরু থেকেই ছিল সত্যিকার অর্থেই সমাজের আয়না। সংবাদের প্রতিটি পাতা চোখের সামনে মেলে ধরলে সমাজকে দেখা যেত, দেশের বহমান সময়ের একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যেত। দীর্ঘ পথ চলতে চলতে সংবাদ এখন বয়সের ৬৬ বছরে পা রাখছে, এখনও সংবাদ সমাজের আয়না হিসেবেই আছে। দেশ ও সমাজের নানা ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবর্তনের নানা ঘটনার পরও সংবাদ পাল্টায়নি, তার সেই 'সমাজের আয়না' চরিত্র এখনও ধরে রেখেছে। যারা এখন সংবাদের কর্ণধার, আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার মানসিকতা তাদের নেই। সময়ে সময়ে তারা সগর্বে সেই কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

সংবাদ যে গৌরববোধ দীর্ঘ ৭৫ বছরের পথচলায় অর্জন করেছে তার মধ্য দিয়েই সংবাদ এই সমাজে জীবন সংগ্রামে বিজয়ী এবং সংগ্রামরত মানুষের সংবাদপত্র হিসেবে যেমন, তেমনি সাংবাদিকতা পেশার একটি বস্তুনিষ্ঠ আদর্শিক চেতনা হিসেবেও সগর্বে উজ্জীবিত রেখেছে।

দীর্ঘ পথযাত্রায় দৈনিক সংবাদ বাংলাদেশে সাংবাদিকতার পথ প্রদর্শক হিসেবেও অবদান রেখেছে বললে বেশি বলা হবে না। অনেক সাংবাদিককে পদ্ধতিগতভাবে তৈরি করা, বস্তুনিষ্ঠ পেশাদারিত্বের দিক নির্দেশনা দেওয়া - এটি সংবাদের আজীবনের আদর্শ ছিল, এখনও আছে। সংবাদ কর্তৃপক্ষ এই আদর্শ দেশকাল ও সময়ের প্রয়োজনে সচেতনভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাদেশে সংবাদপত্রকে অনেকেই বিত্ত, বৈভব অর্জনের পথ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, এখনও করছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। এক্ষেত্রে সংবাদের কর্ণধারদের ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তারা কেউ সংবাদপত্রকে বাণিজ্য করার ইচ্ছায় কখনোই ব্যবহার করেননি। সাংবাদিকতার সঙ্গে, সংবাদপত্র শিল্পের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যকে গুলিয়ে ফেলেননি তারা, গুলিয়ে ফেলতে চাননি কখনোই। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এখানেই সংবাদ কর্তৃপক্ষের স্বকীয়তা, ভিন্নমাত্রা। আর এটি তারা লালন করে আসছেন নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়েও। দুঃসহ সময় পেরিয়েছেন, বিরূপ অবস্থা মোকাবেলা করেছেন, দুর্যোগ-দুর্বিপাকেও পড়েছেন, কিন্তু পথ থেকে সরে যাননি।

এই যে সংবাদ কর্তৃপক্ষের কর্মনিষ্ঠা, বস্তুনিষ্ঠ নীতি-আদর্শ তা সংবাদের জন্মলগ্নের কিছুদিন পর থেকেই চলে আসছে। এই আদর্শ সংবাদ প্রকাশনার প্রথম দিকে যেমন ছিল এখন সাড়ে সাত দশকের পথ পরিক্রমার পরও একই সত্য প্রতিভাত হয় সংবাদ সম্পর্কে আলোচনার সময়। কালের যাত্রায় এই জনপদের সমাজ, রাজনীতি ও মানবিক চিন্তার আদর্শিক অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদের প্রচার-প্রসারে হয়তো কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে কিন্তু আদর্শের পথে অবিরাম চলার বাতিক পরিবর্তন হয়নি। আর এখানেই বস্তুনিষ্ঠ কাজের প্রতি সংবাদের দায়িত্বশীলতার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলাভাষাভাষী অধ্যুষিত এই ভূখণ্ডে সংবাদপত্র প্রকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সংবাদপত্রের উদ্ভব হয়েছিল এই অঞ্চল থেকেই। কিন্তু এর বিকাশের ধারা সমৃদ্ধ হয়েছে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায়। সেখানেই বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক বিত্ত-বৈভব বিকাশের সঙ্গে সংবাদপত্রও তার অবয়ব এবং চরিত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। সেই সময়ে এই অঞ্চলের, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মানুষের বিদ্যার্জন থেকে শুরু করে রুটি-রুজির বড় ঠিকানা ছিল কলকাতা। সংবাদপত্র প্রকাশ ও বিকাশও সেখানেই শুরু হয়। ব্রিটিশদের বিতারণ এবং ভারত বিভক্তির পর কলকাতার জৌলুসে ভাটা পড়ে এবং নতুন দেশে নতুন আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তৈরি হয় পূর্ববঙ্গের ঢাকায়, সংবাদপত্র শিল্পও নতুন মাত্রা পায়। কলকাতার সমাজে যেভাবে এবং যে প্রয়োজনে সংবাদপত্র তার অবয়ব তৈরি করেছিল ঢাকায় তা পরিবর্তিত হয়ে গেলো বাস্তবতার ছোঁয়ায়। ভারত বিভক্তির পর কলকাতায় স্থিতিশীল সামাজিক অবস্থান সৃষ্টি হয়, সমান্তরাল ধারায় বিকশিত হয় সংবাদপত্রও।

কিন্তু ঢাকার বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। এখানকার অধিকাংশ কর্মপ্রয়াসের শুরু বিভাগ কলকাতায় হলেও পূর্ব পাকিস্তানে সেই সবকিছু কলকাতা থেকে অনেকটা ভিন্নভাবে পথচলা শুরু করে। সংবাদপত্রও তার ব্যতিক্রম ছিল না। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান এবং তার এক অংশ ব্রিটিশ ভারতের পূর্ববঙ্গ 'পূর্ব পাকিস্তান' হিসেবে আবির্ভূত হয়। পূর্ববঙ্গ 'পূর্ব পাকিস্তান' হলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানোর কোনো সুযোগ রাখেনি পাকিস্তানী বিজাতীয় শাসকরা। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হতে থাকে। তার প্রভাব পড়ে এখানকার রাজনীতিতে। রাজনীতি হয়ে ওঠে 'এন্টি পাকিস্তানী', পাকিস্তানী শাসন-শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদী রাজনীতি। কলকাতায় যে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ছিল ঢাকার পরিস্থিতি হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এটি ছিল নতুন বাস্তবতা। ফলে এখানে এনে কলকাতার সংবাদপত্র নতুন করে প্রকাশ এবং নতুন সংবাদপত্র প্রকাশ, বিকাশ এসব কর্ম সম্পাদনের সময় এবং নতুন বাস্তবতার অধিবাসীসহ সকল শ্রেণীর পাঠকদের কাছে আরও বেশি ও ভিন্ন মাত্রায় সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরার লক্ষ্যে সাংবাদিকতার আদর্শ ও নীতি নৈতিকতা তৈরির প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই অনুভবের সুতিকাগার ছিল দৈনিক সংবাদ। সংবাদই প্রথম সাংবাদিকতার ভিন্ন রূপ তুলে ধরেছে পাঠকদের সামনে।

কলকাতাভিত্তিক সংবাদপত্র যেগুলি পরে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল বলা যায় আজাদ, মিল্লাত, ইত্তেহাদ-এর নাম। এসব সংবাদপত্রের আদর্শ ছিল অনেকটা ধর্মীয় চেতনাভিত্তিক। কলকাতায় পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এসব সংবাদপত্র চরম জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। অন্য কথায় বলা যায় বাঙালি পাঠক এবং ধর্মীয় চেতনায় অভিষিক্ত মানুষদের জাগিয়ে তুলতে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে এই ধারার সংবাদপত্রগুলি। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক ও উদার গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা ও প্রগতিশীল মানসিকতা এই শ্রেণীর সংবাদপত্রের মধ্যে ছিল বলা যায় না, থাকলেও তা ছিল ছোট্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ।

ঢাকায় নতুন সংবাদপত্র প্রকাশের সময় সকল মানুষের জন্য সংবাদপত্রকে সাজানো ছিল তখনকার সামাজিক বাস্তবতা এবং চাহিদা। কিন্তু কলকাতা থেকে ঢাকায় আসা সংবাদপত্রে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় নি। ফলে সে ধারা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজন দেখা দেয়। কলকাতার সেই চেতনার বলয় থেকে বেরিয়ে আসা ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র ছিল দৈনিক সংবাদ। সংবাদের সৃষ্টি এবং বিকাশ ঢাকাতেই। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তাচেতনা নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত এবং বিকশিত হয়েছিল। সংবাদ শুরুতেই সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা ঝেড়ে মুছে নতুন ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করেছিল। আর তা হলো উদার গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল মুক্তবুদ্ধির চেতনা। একই সঙ্গে শোষণ বিরোধী অবস্থানও যুক্ত হয়েছিল সংবাদের আদর্শের সঙ্গে। আর এসব পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রের সাধারণ আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরপর অবশ্য ইত্তেফাক এসে একই চেতনার বিস্তার ঘটাতে সচেষ্ট হয়। তবে সংবাদের জন্য এসব আদর্শ ও নীতি অনেকটা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এটি করেছিলেন সংবাদের কর্ণধাররা অত্যন্ত সচেতনভাবে এবং প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চেতনা ও পাকিস্তানের বিজাতীয় শাসন বিরোধী মনোভাবের উত্তরসূরী হিসেবে। তাদের মেধা ও আদর্শের ঔজ্জ্বল্যই বাংলাদেশ ভূখণ্ডে (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ও স্বাধীন বাংলাদেশ) সংবাদপত্রের ভিন্ন মাত্রা এবং জ্ঞানের চর্চার মাধ্যম হিসেবে পাঠকদের নতুন সংবাদপত্র যা কলকাতার সংবাদপত্র থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিল। সেই সংবাদপত্রই পাঠকদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা লাভ করেছিল।

আগেই বলেছি, সংবাদ দীর্ঘ দিন ধরেই খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতান্ত্রিক এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মুক্ত চিন্তা-চেতনাকে ধারণ করে পথ চলেছে, ভবিষ্যতেও চলবে, আজ সংবাদের শুভজন্মদিনে এই প্রত্যাশা আমাদের সবার।

লেখক : চিফ রিপোর্টার, সংবাদ

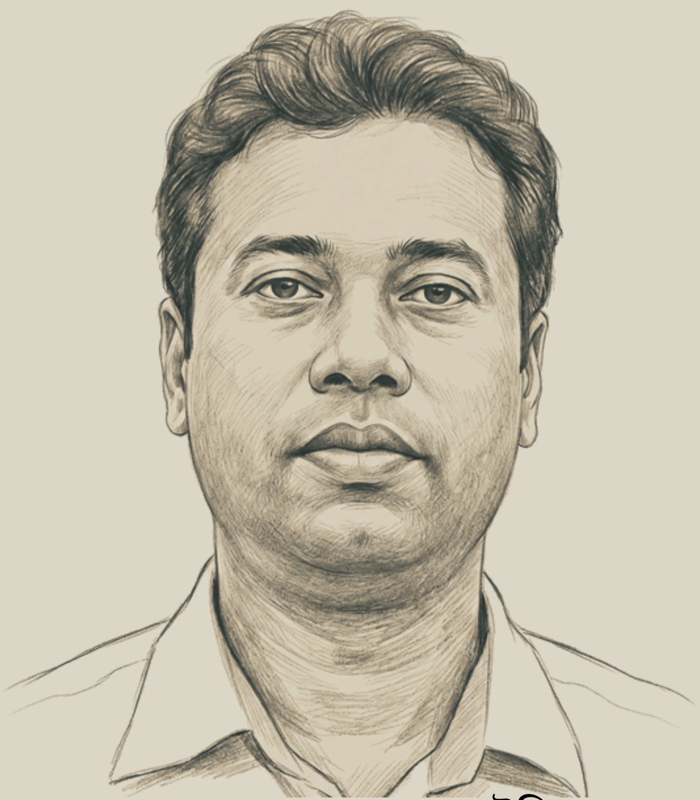

সংবাদের চারণ-পুরুষ মোনাজাতউদ্দিন

আতাউর রহমান সোহাগ

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে ‘সংবাদ’একটি অনন্য নাম। দীর্ঘ ৭৬ বছরের পথচলায় এই পত্রিকাটি এদেশের প্রগতিশীল রাজনীতি, সংস্কৃতি ও গণমুখী সাংবাদিকতার ধারক হিসেবে কাজ করেছে। এই দীর্ঘ যাত্রায় বহু নক্ষত্রতুল্য সাংবাদিক সংবাদের পাতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তবে মফস্বল সাংবাদিকতা কিংবা তৃণমূলের মানুষের কথা বলতে গেলে সবার আগে উচ্চারিত হয়- তিনি আর কেউ নন, চারণ সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন।

আজ ১৭ মে, সংবাদের ৭৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই বিশেষ ক্ষণে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সেই নির্ভীক কলমযোদ্ধাকে, যিনি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষের আয়েশ ছেড়ে ধুলোবালি মাখা মেঠোপথকে বেছে নিয়েছিলেন তার কর্মস্থল হিসেবে।

সংগ্রামের দিনগুলি

১৯৪৫ সালের ১৮ জানুয়ারি তৎকালীন ‘মঙ্গাখ্যাত’ উত্তরাঞ্চলের রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার এক নিভৃত পল্লীতে জন্ম নেন মোনাজাতউদ্দিন। তার বাবা মৌলভী আলীম উদ্দীন আহমেদ এবং মা মতিজান নেছা। মোনাজাতউদ্দিনের শৈশব ও বেড়ে ওঠা ছিল চরম অভাব আর অন্তহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তিনি রংপুরের ঐতিহ্যবাহী কৈলাশরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাসের পর কারমাইকেল কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করেন। কিন্তু স্নাতক (বিএ) শ্রেণিতে পড়ার সময় হঠাৎ বাবার মৃত্যু তার জীবনে পাহাড়সম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পরিবারের সাত ভাই-বোনের মধ্যে সবার বড় হওয়ায় সংসারের পুরো জোয়াল তখন তার তরুণ কাঁধেই চাপে। অভাবের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে নিয়মিত পড়াশোনা থমকে গেলেও দমে যাননি তিনি; অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরে পরবর্তীতে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। জীবনের এই কঠিন কষাঘাত আর দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই-ই তাকে শিখিয়েছিল সাধারণ মানুষের অন্তরের ব্যথা আর চোখের ভাষা পড়তে।

‘সংবাদ’ অধ্যায়

মোনাজাতউদ্দিনের সাংবাদিকতা জীবনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৬ সালে ‘দৈনিক আজাদ’-এর মাধ্যমে। এরপর ১৯৭২ সালে তিনি নিজেই প্রকাশ করেন ‘দৈনিক রংপুর’। তবে তার সাংবাদিক সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে ১৯৭৬ সালে যখন তিনি ‘দৈনিক সংবাদ’-এ যোগ দেন। দীর্ঘ প্রায় দুই দশক তিনি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে উত্তরবঙ্গের অবহেলিত জনপদ, মঙ্গা পীড়িত মানুষের হাহাকার আর গ্রামীণ রাজনীতির কূটচাল সংবাদের পাতায় নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাকে যথার্থই বলা হয় ‘চারণ সাংবাদিক’। প্রাচীনকালের চারণ কবিরা যেমন গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে গান গেয়ে বেড়াতেন, মোনাজাতউদ্দিনও তেমনি কাঁধে খদ্দরের ঝোলা ব্যাগ আর হাতে নোটবুক নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে বেড়াতেন খবরের সন্ধানে। তার কাছে খবর মানে কেবল শুষ্ক তথ্য ছিল না, ছিল মানুষের যাপিত জীবনের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

মফস্বল সাংবাদিকতার ব্যাকরণ

মোনাজাতউদ্দিনের সবচেয়ে বড় কীর্তি ছিল সংবাদের পাতায় প্রকাশিত ‘পথ থেকে পথে’ শীর্ষক ধারাবাহিক প্রতিবেদন। এটি কেবল একগুচ্ছ খবর ছিল না, বরং বাংলাদেশের মফস্বল সাংবাদিকতার এক নতুন দিগন্ত। তিনি এমন সব মানুষের কথা লিখতেন যারা কোনোদিন খবরের শিরোনাম হতে পারেনি; ছিন্নমূল মানুষ, চরাঞ্চলের কৃষক, নদীভাঙা পরিবার-এরাই ছিল তার প্রতিবেদনের নায়ক। সংবাদে থাকাকালীন তার ‘মানুষ ও সমাজ’ বিভাগটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়, যার জন্য তিনি মর্যাদাপূর্ণ ‘ফিলিপস পুরস্কার’-এ ভূষিত হন। এর মাধ্যমে তিনি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যাওয়া দুর্নীতি ও কুসংস্কারকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন। তার অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কেবল সমস্যার কথা বলত না, বরং নীতিনির্ধারকদের বাধ্য করত সেই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিতে। তার লেখনী ছিল শাণিত ও ধারালো, কিন্তু তার অন্তঃকরণ ছিল মানুষের প্রতি গভীর সংবেদনশীল।

সৃজনশীলতার ভুবন

মোনাজাতউদ্দিন কেবল একজন ক্ষুরধার প্রতিবেদক ছিলেন না, ছিলেন একাধারে নাট্যকার, ছড়াকার ও শক্তিমান কথাসাহিত্যিক। তার লেখা বইগুলো আজও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাছে মফস্বল সাংবাদিকতার পাঠ্যবই হিসেবে সমাদৃত। ‘সংবাদের নেপথ্য’, ‘পথ থেকে পথে’, ‘নিজস্ব রিপোর্ট’, ‘শাহ আলম ও মজিবের কাহিনী’, ‘পায়ের নিচে সর্ষে’ এবং ‘কাগজের মানুষ’ বইগুলো তার জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতার নির্যাস। প্রতিটি বইয়ে তিনি খবরের পেছনের খবর আর একজন সাংবাদিকের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া তার লেখা নাটক ও ছড়ায় সমাজ সংস্কার আর শোষিত মানুষের অধিকার আদায়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।

সম্মাননা ও স্বীকৃতি

সাংবাদিকতায় অসামান্য অবদানের জন্য মোনাজাতউদ্দিন অসংখ্য সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। ১৯৮৪ সালে ‘সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী স্মৃতি পদক’ লাভ করেন। এছাড়া দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত ‘মানুষ ও সমাজ’ প্রতিবেদনের জন্য ১৯৮৭ সালে মর্যাদাপূর্ণ ‘ফিলিপস পুরস্কার’ পান। একই বছর লাভ করেন ‘বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স’ পুরস্কার। তৃণমূল সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৫ সালে তিনি আন্তর্জাতিক ‘অশোকা ফেলোশিপ’ লাভ করেন। তার অসামান্য কর্মের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯৭ সালে তাকে মরণোত্তর ‘একুশে পদক’-এ ভূষিত করা হয়।

অমীমাংসিত প্রস্থান

১৯৯৫ সালে মোনাজাতউদ্দিন ‘সংবাদ’ ছেড়ে ‘দৈনিক জনকণ্ঠ’ পত্রিকায় যোগদান করেন। এর মাত্র কয়েক মাসের মাথায়, ২৯ ডিসেম্বর যমুনা নদীতে ‘শহীদ বরকত’ ফেরি থেকে পড়ে গিয়ে তার রহস্যজনক মৃত্যু হয়। তার এই প্রস্থান আজও বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক গভীর ক্ষত ও অমীমাংসিত প্রশ্ন হয়ে আছে। তিনি কি সত্যিই যমুনার প্রবল স্রোতে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলেন, নাকি এর পেছনে ছিল কোনো স্বার্থান্বেষী মহলের সুগভীর ষড়যন্ত্র? তৎকালীন সরকারের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন আজও আলোর মুখ দেখেনি, যা এই রহস্যকে আরও ঘনীভূত করেছে। দীর্ঘ তিন দশক পেরিয়ে গেলেও বাংলাদেশের গণমাধ্যমকর্মীরা আজও সেই সত্যটি জানতে চায়-কী ঘটেছিল সেই শীতের সকালে?

আধুনিক সাংবাদিকতায় মোনাজাতউদ্দিনের প্রাসঙ্গিকতা

আজ যখন সাংবাদিকতা করপোরেট সংস্কৃতির চাপে অনেকটা শহরকেন্দ্রিক এবং চটকদার খবরের দিকে ঝুঁকছে, তখন মোনাজাতউদ্দিন আমাদের শিখিয়ে দিয়ে যান সাংবাদিকতা আসলে কার জন্য। তিনি প্রমাণ করেছেন, এসি রুমে বসে ইন্টারনেট ঘেঁটে যা পাওয়া যায় না, তা পাওয়া যায় মানুষের চোখের জলে আর ঘামের গন্ধে। 'সংবাদ'-এর ৭৬ বছরের দীর্ঘ ঐতিহ্যের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছেন এই চারণ সাংবাদিক। মোনাজাতউদ্দিন চলে গেছেন ঠিকই, কিন্তু তার জীবন ও কর্ম আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছে- সাংবাদিকতা কেবল পেশা নয়, এটি একটি আজন্ম সাধনা। সংবাদের পাতায় পাতায় তিনি বেঁচে থাকবেন তার অমর লেখনীর মাধ্যমে।

লেখক : ন্যাশনাল ডেস্ক এডিটর, সংবাদ

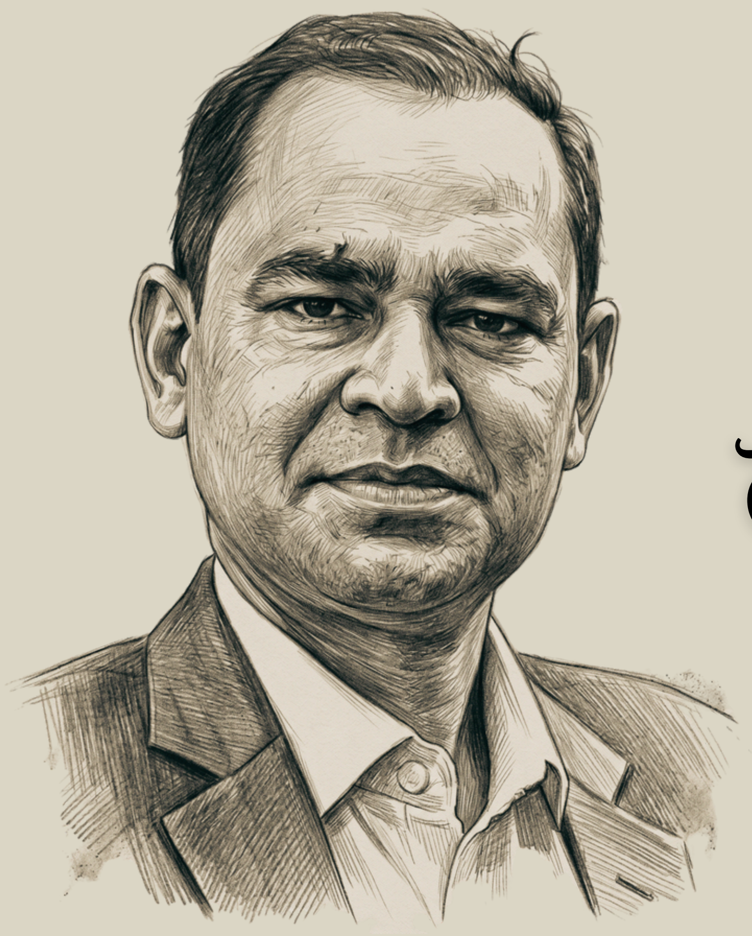

সময়ের সাক্ষী, সত্যের সহযাত্রী দৈনিক সংবাদের গৌরবময় পথচলা

আকাশ চৌধুরী

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, যাদের পরিচয় শুধু একটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে সীমাবদ্ধ নয়; তারা একটি জাতির ইতিহাস, সংগ্রাম, চেতনা ও মূল্যবোধের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দৈনিক সংবাদ তেমনই একটি প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ১৯৫১ সালের ১৭ মে যাত্রা শুরু করা এই পত্রিকাটি দীর্ঘ সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে সত্য, ন্যায়, গণতন্ত্র এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল দৃশ্যমান, দায়িত্বশীল এবং সাহসী।

দৈনিক সংবাদ সব সময় পূর্ব বাংলার মানুষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়েও সংবাদ সত্য প্রকাশে আপস করেনি। পরবর্তী সময়ে ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতেও এই পত্রিকা জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রগঠন, গণতন্ত্রের বিকাশ এবং সমাজের অসঙ্গতি তুলে ধরার ক্ষেত্রে সংবাদ দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে ওঠে।

দৈনিক সংবাদের শক্তির মূল উৎস তার সম্পাদকীয় দর্শন। এই পত্রিকার সম্পাদনাসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন দেশের সাংবাদিকতা জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র আহমেদুল কবির, সন্তোষ গুপ্ত, বজলুর রহমান এবং খন্দকার মনিরুজ্জামানের মতো কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব। তাঁদের কলম ছিল যুক্তিনিষ্ঠ, সাহসী এবং মানবিক। তাঁরা সংবাদকে কেবল একটি পত্রিকা হিসেবে পরিচালনা করেননি; তাঁরা এটিকে একটি চিন্তার কেন্দ্র, একটি মূল্যবোধের বিদ্যালয় এবং একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপ দিয়েছেন। তাঁদের লেখা আজও সাংবাদিকতা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রেরণার উৎস।

দৈনিক সংবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি সবসময় সাধারণ মানুষের কথা বলেছে। কৃষকের মাঠের সংকট, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, শিক্ষকের দাবি, শিক্ষার্থীদের আন্দোলন, নারীর অধিকার, সংস্কৃতির বিকাশ, পরিবেশ রক্ষা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সবক্ষেত্রেই সংবাদ স্পষ্ট ও দায়িত্বশীল অবস্থান নিয়েছে। এ কারণেই পত্রিকাটি পাঠকের কাছে কেবল খবরের উৎস নয়; এটি আস্থা, নির্ভরতা এবং নৈতিকতার প্রতীক।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের অংশ হতে পেরে গভীর গর্ব অনুভব করি। ২০০৭ সাল থেকে দৈনিক সংবাদে কর্মরত থাকার সুবাদে আমি এই প্রতিষ্ঠানের ভেতরের শক্তি, নীতি এবং সংস্কৃতিকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। এই দীর্ঘ সময়ে উপলব্ধি করেছি, সংবাদ শুধু একটি কর্মস্থল নয়; এটি একটি পরিবার, একটি শিক্ষাঙ্গন এবং একটি দায়িত্ববোধের নাম। এখানে কাজ করতে গিয়ে শিখেছি, সাংবাদিকতার মূল ভিত্তি হলো সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা, তথ্যের যথার্থতা এবং জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া।

দৈনিক সংবাদের কর্মপরিবেশ নতুন ও পুরোনো প্রজন্মের সাংবাদিকদের মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সেতুবন্ধন তৈরি করে। প্রবীণ সহকর্মীদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ, সম্পাদকীয় বৈঠকে মতবিনিময়, এবং প্রতিটি সংবাদ যাচাই-বাছাইয়ের কঠোর প্রক্রিয়া একজন সাংবাদিককে পেশাগতভাবে সমৃদ্ধ করে। সংবাদে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে, দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা কখনও তাড়াহুড়োর বিষয় নয়; এটি সততা, ধৈর্য ও নিষ্ঠার সমন্বয়।

বর্তমান যুগে সংবাদমাধ্যমের চরিত্র দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং তাৎক্ষণিক তথ্যপ্রবাহের যুগে অনেক সময় যাচাই-বাছাইয়ের চেয়ে দ্রুততা বেশি গুরুত্ব পায়। এমন বাস্তবতায় দৈনিক সংবাদ তার ঐতিহ্য, বিশ্লেষণধর্মী উপস্থাপন এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যের মাধ্যমে স্বতন্ত্র অবস্থান ধরে রেখেছে। প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়েও পত্রিকাটি তার নৈতিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়নি। এটাই তার সবচেয়ে বড় সাফল্য।

দৈনিক সংবাদের শক্তি শুধু সম্পাদক বা প্রতিবেদকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর পেছনে আছেন অসংখ্য কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রুফরিডার, পাতা সম্পাদক, ফটোগ্রাফার, মুদ্রণকর্মী, পরিবেশক এবং সর্বোপরি পাঠক। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিদিন একটি পত্রিকা পাঠকের হাতে পৌঁছে যায়। এই অদৃশ্য শ্রমই একটি সংবাদপত্রকে প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে।

বর্ষপূর্তির এই মাহেন্দ্রক্ষণে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি প্রতিষ্ঠাতা, সাবেক সম্পাদক, সাংবাদিক, লেখক, কলামিস্ট এবং সকল সহকর্মীকে, যাঁদের নিষ্ঠা ও মেধায় দৈনিক সংবাদ আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে। একই সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাই সেই সব পাঠককে, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এই পত্রিকার প্রতি আস্থা রেখেছেন। পাঠকের বিশ্বাসই একটি সংবাদপত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি।

দৈনিক সংবাদ বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ। সত্য প্রকাশের সাহস, গণমানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে এই পত্রিকার যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজও সেই অঙ্গীকার অটুট রয়েছে। সময়ের পরিবর্তনে মাধ্যম বদলাবে, প্রযুক্তি বদলাবে, পাঠকের অভ্যাসও বদলাবে; কিন্তু দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার প্রতীক হিসেবে দৈনিক সংবাদের মর্যাদা কখনও ম্লান হবে না।

বর্ষপূর্তির এই গৌরবময় মুহূর্তে আমার প্রত্যাশা—দৈনিক সংবাদ আগামী দিনেও একই সততা, সাহস এবং পেশাদারিত্ব নিয়ে জাতির পাশে থাকবে। নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের জন্য এটি আরও বড় অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অবিচল এই ঐতিহ্যবাহী পত্রিকার উত্তরোত্তর সাফল্য, সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

লেখক : স্টাফ রিপোর্টার, সিলেট

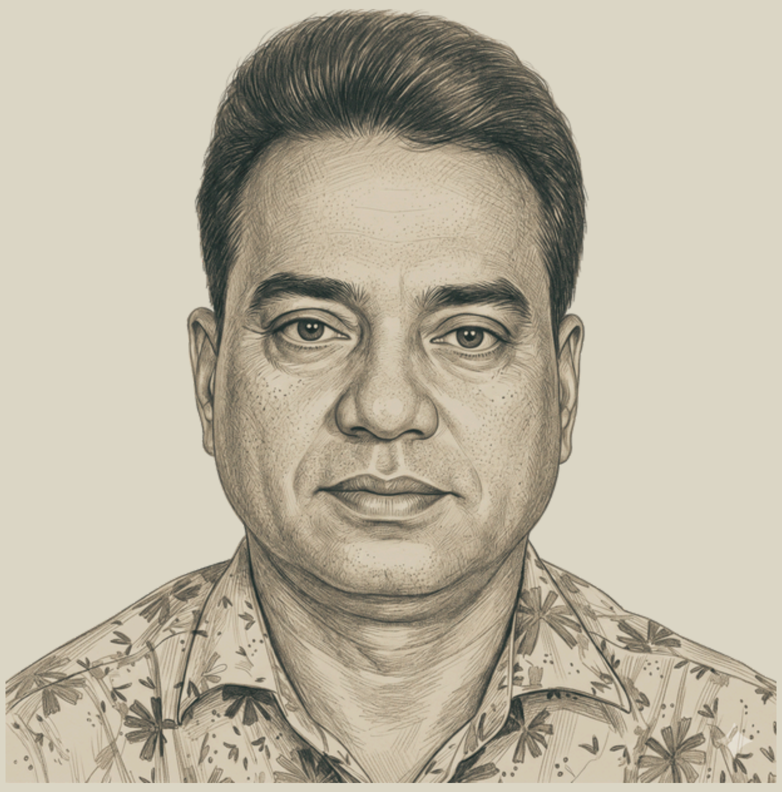

সংবাদ-এর সঙ্গে আমার চার দশকের বসবাস

চিত্ত ঘোষ

তারিখটা ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ সাল। সকাল ১০টার মধ্যে জন্ডিসে আক্রান্ত ও জ্বর নিয়ে হাজির হলাম বংশাল সংবাদ অফিসে। উদ্দেশ্য দিনাজপুর সংবাদদাতা নিয়োগের ইন্টারভিউ দিতে। আমি ছাড়াও দিনাজপুর হতে আরো দুইজন আবেদন করেছিলেন।একজন আবুল হাসনাত, অপরজন গোলাম নবী দুলাল। প্রথম জন ঢাকায় যাননি এবং দ্বিতীয়জন সংবাদ অফিসে উপস্থিত হয়েও কিছুক্ষণ পর চলে আসেন। শেষ পর্যন্ত ইন্টারভিউতে উপস্থিত হননি।

একটা গুদাম ঘরের মতো অফিসে লোকজন শূন্য, আলো কম- দিনেই অন্ধকার। একজন পিয়ন জিজ্ঞেস করলেন কার খোঁজে এসেছি, বললাম দিনাজপুর হতে, ইন্টারভিউ দিতে। ও বুঝছি। একটা বেঞ্চ দেখিয়ে বললেন, বললেন, আপনি বহেন আমি চা খাইয়া আহি। শুরু হলো আমার অপেক্ষার পালা। বেশ কিছুক্ষণ পর শ্যামবর্ণের লম্বা ছিপছিপে গড়ন চোখে কালো ফ্রেমের চশমা গায়ে ধূসর রংয়ের চাদর হাতে কয়েকটি বই নিয়ে মধ্য বয়সী এক ভদ্রলোক অফিসে প্রবেশ করলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম, সালাম জানালাম। মাথা নেড়ে সালাম গ্রহণ করলেন।

হার্ড বোর্ডের ঘেরা দেওয়া একটি কক্ষে গিয়ে তিনি বসলেন। তিনি যে চেয়ারে বসলেন এবং যেখানে বেঞ্চে বসে ছিলাম একেবারে দু'জন মুখোমুখি হয়ে গেলাম। কয়েক মুহূর্ত পর তিনি ক্ষীণস্বরে 'বসির' 'বসির' বলে ডাক দিলেন। যাকে প্রথম সাক্ষাতে পেলাম তিনি দৌড়ে গেলেন তার সামনে। কয়েকগজ দূরত্বে কথোপকথন শোনা যায়। এখানে একটা কাগজ ছিল, তা পাচ্ছি না। ক'জন এসেছে? একজনই তো দেখতাছি। চা দিয়েছো?

চা এলো, চা পান করার ফাঁকে বসির ভাইয়ের সঙ্গে পরিচিত হলাম। তিনি কে জানতে চাইলে বশির ভাই জানালেন তিনি সন্তোষ গুপ্ত। সংবাদ-এর ভারপ্রাপ্ত বার্তা সম্পাদক। খবরের কাগজে ছাপা ছবির সঙ্গে মিল খুঁজে পেলাম। সত্যিই তিনি সন্তোষ দা। আরো কিছুক্ষণ পর তৃতীয় মানুষটি এলেন এবং আমার সামনে টেবিলের ওপাশের চেয়ারে বসলেন।

বসির ভাই জানালেন, ইনি জীবন চৌধুরী সংবাদের মফস্বল সম্পাদক। খুবই আগ্রহ নিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় হতে নিজের নাম ও জেলার নাম উল্লেখ করলাম। তার টেবিলের বিপরীতে শূন্য চেয়ারগুলোতে বসতে বললেন না। বেঞ্চ দেখিয়ে কর্কশ স্বরে বললেন, যেখানে বসে ছিলেন সেখানেই অপেক্ষা করেন, সময় হলে ডাকবো। তার আচরণ দেখে মনে হলো খিটখিটে মেজাজ ও রাগী প্রকৃতির মানুষ সে।

শরীরে জ্বর অস্থির অস্থির লাগছিল। কখনো শরীর দিয়ে ঘাম ঝরছে, কখনো শীতশীত অনুভব হচ্ছিল। ১৯৭৮ সাল তখন আমি কেবল ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি। তখন হতে সংবাদে হাতে লেখা খবর নিয়মিত ডাকযোগে পাঠাতে শুরু করি। আমার পাঠানো বেশির ভাগ খবর সংবাদের পাতায় স্থান পেত না। মাসে দু-একটা ৫/৬ লাইনের খবর কোনো পাতায় স্থান পেত ভাগ্যক্রমে। তাতেই মস্তবড় আনন্দ হতো। সেই সংবাদ পত্রিকাটি সপ্তাহ কাল ধরে হাতে থাকতো।

দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এক ভদ্রলোক অফিসে প্রবেশ করলেন। চোখে সোনালি রংয়ের চিকন ফ্রেমের চশমা। ক্ষীণকায় পরিপাটি পোশাক ঠোঁটে মুচকি হাসি- প্রথম দর্শনেই দাঁড়িয়ে তাকে প্রণাম জানালাম। দেখে তাকে চিনতে ভুল করিনি। তিনিই শ্রদ্ধেয় বজলু ভাই (বজলুর রহমান, সংবাদ-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক)। তিনি তার নির্ধারিত কক্ষে গিয়ে বসলেন। তাকে দেখার পর হতে স্নায়ুচাপ আরো বেড়ে গেল।

মফস্বল সম্পাদক একটা ফাইল নিয়ে ভিতরে গেলেন। এই বুঝি ডাক পড়বে। অবশেষে ডাক এলো ঘড়িতে তখন সোয়া ১টা। সন্তোষদার সঙ্গে দেখা করে হার্ডবোর্ড পার্টিশনের ছোট্ট কক্ষটিতে ঢুকলাম। দেখি বজলু ভাই বসে আছেন। তিনি যে চেয়ারটিতে বসে আছেন তার তিন পাশেই অসংখ্য বই ও পত্রিকা দিয়ে ঠাঁসা। টেবিলের সামনে একটা চেয়ার। সালাম জানালাম। আমাকে বসতে বললেন।

খুবই ধীর স্থিরভাবে চেয়ারের কোণায় বসলাম। কোথায় কি যেন ভুল করে বসি। তিনি টেবিলে রাখা ফাইল দেখছিলেন। কী নাম, বাড়ি কোথায়? দিনাজপুরেকাকে কাকে চেনেন? উত্তরে বললাম, রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিকঅঙ্গণে যারা নেতৃত্বে আছেন কমবেশি সকলেই আমাকে জানেন। রহিম ভাইকে (সাবেক এমপি এএম আব্দুর রহিম) চেনেন? বললাম জানি এবং তার সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। তিনি টেলিফোনের রিসিভার তুলে বললেন, দিনাজপুরের রহিম সাহেবের সঙ্গে আমাকে সংযোগ করে দিন।

সংবাদে ছাপা হয়েছে আপনার কোনো খবরের কাটিং এনেছেন? আমি সবগুলো খবরের কাটিং তার সামনে দিলাম। একটা খবর তুলে নিয়ে আমাকে দিলেন। বললেন পড়েন। খবরটি ছিল সদ্য আমন মওসুমে আভ্যন্তরীণ ধান সংগ্রহ অভিযান। খাদ্য বিভাগের অধীনে এই সংগ্রহ মওসুম পরিচালনা হলেও সরকারিভাবে সংগ্রহ অভিযানকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হতো। জেলার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জেলা প্রশাসকসহসর্বস্তরের কর্মকর্তামাঠ পর্যায়ে বেশ তৎপর হয়ে উঠতেন। খাদ্যশস্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত জেলা হিসেবে পরিচিত ও শস্যভাণ্ডারখ্যাত দিনাজপুর জেলায় সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত সে সময় জেলা পর্যায়ের জেলা প্রশাসক 'কর্ডেনিং প্রথা' চালু করতেন। আমার খবরের একাংশে উল্লেখ ছিল, 'সংগ্রহ অভিযান সফল করতে জেলা প্রশাসক জেলায় কর্ডেনিং প্রথা চালু করেছেন (উৎপাদিত ধান যেন জেলার বাইরে যেতে না পারে)।
তিনি (বজলু ভাই) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ডিসি সাহেব কি সঠিক করেছেন? আমি উত্তরে বললাম, না, এটা সঠিক করেননি। তিনি আবার জানতে চাইলেন কেন? আমি উত্তরে বললাম সংবিধান অনুযায়ী পারেন না। কেননা সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে দেশে উৎপাদিত যে কোনো পণ্য দেশের অভ্যন্তরে যে কোনো স্থানে পরিবহনযোগ্য।

তিনি মুচকি হাসলেন। এসময় ফোন বেজে উঠলো, তিনি রিসিভার উঠিয়ে বললেন দেন। বললেন, রহিম ভাই কেমন আছেন, আপনার শরীর ভালো তো? রাজনীতির খবরা খবর নিয়ে প্রায় ৮/১০ মিনিট কথা বলার পর তিনি তার (রহিম চাচা) কাছে জানতে চাইলেন, আমার সামনে দিনাজপুরেরচিত্ত ঘোষ নামে একজন বসে আছেন, তাকে চেনেন? রহিম চাচা কী বললেন তাৎক্ষণিক আমি জানতে পারিনি। আরো মিনিট পাঁচেক কথা বলে বজলু ভাই রিসিভার রেখে দিলেন।

আরো কয়েকটি নিউজ কাটিং দেখলেন। পরিবেশ বেশ চুপচাপ। কলিং বেল টিপলেন বসির ভাই আসলেন আর ক'জন আছে? বসির ভাই বললেন, আর কেউ নাই স্যার। মাঝে একটা প্রশ্ন করেছিলেন আবুল হাসনাত কেমন রিপোর্টার? উত্তরে বললাম, আমার চেয়ে ভালো। আমার মুখের দিকে তাকালেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, হাসনাত এলেন না কেন? উত্তরে বললাম, আমি জানতাম তিনি আবেদন করেছেন। ইন্টারভিউর কার্ড পেয়েছেন এবং তিনি আসবেন। তিনি বললেন, আপনাকে নিয়োগ দেয়া হলে খবর পাঠাবেন কেমন করে? সাধারণ খবরগুলো ডাকযোগে এবং জরুরি খবর প্রেস টেলিগ্রামকরে। ঠিক আছে ছবি পাঠাতে পারবেন তো? হ্যাঁ পারবো। বললেন ঠিক আছে এখন আসতে পারেন। দিনাজপুর যাবেন কবে? শিগগিরই ফিরবো।

সংবাদ অফিস হতে ফিরে ঐদিন বিকেলে লঞ্চে উঠে গিয়ে পৌঁছলাম বিক্রমপুরের সিরাজদিঘানথানার সাতগাঁও গ্রামে আমার মেজ পিসির বাড়িতে। সেখানে ছিলেন আমার বড় পিসিমা। তিনি জানতেন জন্ডিসের চিকিৎসা। পরদিন খুব ভোরে ঘুম হতে উঠিয়ে পুকুরের জলে স্নান করিয়ে ভেজা কাপড়েই কনকনে শীতের মধ্যে দই চিড়ার সঙ্গে ঔষধ মিশিয়ে খাওয়ালেন।প্রচন্ড শীতে তিনদিন ধরে এই ব্যবস্থা চললো। আমি দিনাজপুরে ফিরে এলাম ১৫ জানুয়ারি। দেখলাম হলুদ খামে আমার নামে সংবাদ অফিস হতে পাঠানো চিঠি। খুলে দেখলাম নিয়োগপত্র।সংবাদ কর্তৃপক্ষআমাকে ১ জানুয়ারি, ১৯৮৬ হতে দিনাজপুর নিজস্ব সংবাদদাতাহিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। বাবা- মাসহ পরিবারের সকলে খুশি, আমি সাংবাদিক হলাম। সেই হতে সংবাদ আমার হলো, তবে আমি সংবাদের হতে পারলাম কিনা তা আজো জানলাম না।

আমার সংবাদের সঙ্গে আমি দীর্ঘপথ বেয়ে চলছি। কখনো ক্লান্ত মনে হয়নি। এ পথ চলতে গিয়ে অনেকের সান্নিধ্য পেয়েছি। তারা হচ্ছেন- ভারপ্রাপ্ত বার্তা সম্পাদক মোজাম্মেল হক (মন্টু ভাই), কার্তিক চ্যাটার্জী (কার্তিক দা) ইয়াকুব ভাই, বার্তা সম্পাদক মনজুরুল আহসান বুলবুল (বুলবুল ভাই), সোহরাব হাসান (সোহরাব ভাই), মজুমদার জুয়েল, খন্দকার মুনিরুজ্জামান (মুনির ভাই), কাশেম হুমায়ুন ভাই, সালাম জুবায়ের ভাই, কাজী রফিক ভাই, বাকী বিল্লাহ ভাই, রাশেদ আহমেদ (রাশেদ ভাই) আবার ডিজিটালে সহকর্মী হলাম।

অনেক অনেক গুণী সাংবাদিকদেরসান্নিধ্য পেয়ে নিজেকে শাণিত করার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি। যতটুকু মানুষের ভালোবাসা- স্নেহমমতাপেয়েছি তা সংবা- এর কল্যাণেই। সংবাদ আমাকে ভালো থাকতে শিখিয়েছে।সংবাদ আমাকে সৎ সাংবাদিকতারপথ দেখিয়েছে।দীর্ঘ ৪০ বছর আমার যাত্রাপথে সংবাদ ডিজিটালে রূপান্তর হয়েছে। আজো রয়েছি সংবাদ-এর সঙ্গেই। আমার শেষযাত্রাহউক সংবাদ-এর পরিচয়ই বহন করে। সংবাদ-এর জন্মজয়ন্তিতে এ আমার নিবেদন।

লেখক: স্টাফ রিপোর্টার, দিনাজপুর

সংবাদ: আবেগ, ঐতিহ্য ও গণমানুষের দর্পণ

দীপক মুখার্জী

“সংবাদ”-শুধু একটি পত্রিকার নাম নয়, এটি এক আবেগ, এক ইতিহাস এবং এক অবিচল দায়িত্ব বোধের প্রতীক। দি সংবাদ লিমিটেড- যার পরিচিতি বিশ্বজোড়া, সেই প্রতিষ্ঠানের পতাকাবাহী এই দৈনিক নানা ঘাত-প্রতিঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সময়ের পরীক্ষার মধ্যে আজও মাথা উঁচু করে টিকে আছে- এক মহীরুহের মতো।

৭৬ বছরে পা রাখা সংবাদের পথচলা শুরু হয়েছিল প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধারণ করে, অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে ভিত্তি করে সীমাহীন দায়িত্ববোধ ও নিরলস কর্তব্যনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই যাত্রা বিস্তৃত হয়েছে আরও বহুদূর, অর্জন করেছে লক্ষ-কোটি মানুষের অটুট আস্থা। করপোরেট প্রভাবমুক্ত সম্পাদকীয় নীতির কারণে ‘সংবাদ’ হয়ে উঠে গণমানুষের মুখপত্র এবং সমাজের এক নির্ভরযোগ্য দর্পণ।

প্রথিতযশা সাংবাদিকদের অবদান

এই দীর্ঘ ইতিহাসে সামিল হয়েছেন বহু প্রতিথযশা বরেণ্য সাংবাদিক। সংবাদের শুরুর এই প্রথিতযশা সিনিয়র সাংবাদিকদের অবদান অপরিসীম। যেসব নাম উল্লেখ না করলেই নয় তাদের মধ্যে রয়েছেন, জহুর হোসেন চৌধুরী, বজলুর রহমান, তোয়াহা খান, শহীদুল্লাহকায়সার, সন্তোষ গুপ্ত, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সাঈদ আতীকুল্লাহ, কে জি মুস্তফা, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মোজাম্মেল হক মন্টু, আতাউর রহমান আতা, আবুল হাসনাত, ফাহিম মোনায়েম টিপু, মুনিরুজ্জামান, সোহারাব হাসান, জীবন চৌধুরী, শহীদুল ইসলাম, মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, শাহরিয়ার করিম, কাসেম হুমায়ুন, কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, চিররঞ্জন সরকার, জি এম ইয়াকুব, স্বপন দত্ত, মিনু আপা, নিনি আপা, জলি আপা, বকুল মাহবুব, আখতার জাহান মালিক, আব্দুল হামিদ, শান্তনু কাসার, সালাম যুবায়ের, ফরহাদ মাহমুদ ছাড়াও ছিলেন উঁচুমানের বেশ কিছু নিজস্ব বার্তা পরিবেশক। তাদের মধ্যে অনেকে সংবাদের বার্তা, এডিটরিয়াল, সম্পাদনা বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগে নিরলস দায়িত্ব পালন করে পত্রিকাটিকে একটি শক্তিশালী, বস্তুনিষ্ঠও গ্রহণযোগ্য গণমাধ্যমে পরিণত করেছেন। তাদের (উপসম্পাদকীয়) ক্ষুরধার লেখনী, বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি এবং আপসহীন সাংবাদিকতার মাধ্যমে সংবাদ কেবল তথ্য প্রকাশ করেনি- বরং সত্য, ন্যায় ও গণমানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠার মডেল তৈরি করেছেন।

মোনাজাত উদ্দিন

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতারএক অনন্য নাম। সংবাদ–এর অন্যতম বড় শক্তি ছিল মফস্বল সাংবাদিক ও মাঠ পর্যায়ের সংবাদ দাতারা। দেশের রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, খুলনা, ফরিদপুর, যশোর, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। মফস্বলের এই চৌকস সাংবাদিকরা ছিল মেধাবী এবং সংবাদ অনুরাগী একজনের সঙ্গে আরেক জনের তুলনা করা ছিল কঠিন ব্যাপার। এই ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম মোনাজাত উদ্দিন। তিনি ছিলেন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি শুধু সংবাদ সংগ্রহ করতেন না- বরং ঘটনার অন্তরালে থাকা সত্য উন্মোচন করতেন। সমাজের অনিয়ম, দুর্নীতি ও বাস্তবতাকে তিনি গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করতেন, যা অনেক সময় “সংবাদের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট” হিসেবেও পরিচিত ছিল।

উত্তরাঞ্চলের প্রত্যন্তগ্রাম, হাট-বাজার, কৃষিজীবী সমাজ- সবখানেই তার উপস্থিতি ছিল দৃঢ়। মানুষের জীবন সংগ্রামও বাস্তবচিত্র তিনি নির্ভীকভাবে তুলে ধরতেন। তার কাজের মাধ্যমে তিনি শুধু উত্তরাঞ্চলের নয়, সমগ্র দেশের সাংবাদিকতায় এক বিশেষ স্থান তৈরি করেন।

এই সময়ের সংবাদ ছিল যেন সাংবাদিকতার এক “পাঠশালা”- যেখানে সিনিয়র সাংবাদিকদের কাছ থেকে নবীনরা শিখতেন দায়িত্বশীলও অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের কৌশল। সন্তোষ দা শেখাতেন খবরের চমক শিরোনাম বা হেডিং আর ইন্ট্রো।

সম্পাদক আহমদুল কবিরের ভূমিকা ও উত্তরাধিকার

এই দীর্ঘ পথচলায় সম্পাদক আহমদুল কবির-এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেখেছি তাকে কি বলিষ্ঠ ও আত্মমর্যদা সম্পন্ন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব। তিনি রাজনীতিবিদ ছিলেন কিন্তু তার সংবাদপত্রটিকে কখনও রাজনৈতিক প্লাটফর্ম বা ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেননি। তার দৃষ্টিভঙ্গিছিল স্পষ্ট- সংবাদপত্রের শক্তি তার নিরপেক্ষতাও দায়িত্বশীলতায়। তিনি সংবাদ–কে করপোরেট প্রভাব থেকে দূরে রেখে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদায় দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিলেন। তিনি মূল্যায়ন ভিত্তিক মফস্বল সংবাদ দাতাদের স্টাফ রিপোর্টার ও জেলা সংবাদ দাতাদের জুনিয়র স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। যা এখনও বিদ্যমান। তিনি মফস্বল সাংবাদিকদের অবদানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন বলেই একেকজন খবর পাগল সাংবাদিক এখনও টিকে আছে।

তার মৃত্যুর পর তার যোগ্য সন্তান আলতামাশ কবির (মিশু) বাবার দেখানো পথ অনুসরণ করে সংবাদ–এর সম্পাদকীয় স্বাতন্ত্র, নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিকতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। করপোরেট নির্ভরতার যুগের মঝেও তিনি সংবাদকে এখনও স্বাতন্ত্রময় বলিষ্ঠতায়টিকিয়ে রেখেছেন। বাবার মতো সেই উঁচু লম্বা মাথাকে নিচু হতে দেখিনি অন্তত আমি।

এই দীর্ঘ ৭৭ বছরের পথচলায় বহু প্রথিতযশা সাংবাদিক আজ আমাদের মধ্যে নেই। তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তাদের কলম, তাদের সংগ্রাম এবং তাদের নিষ্ঠাই সংবাদ–কে গণমানুষের পত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। উত্তরাঞ্চলের অসংখ্য প্রতিনিধি, মফস্বল সাংবাদিক এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদকেরা এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তি ছিলেন-আজও আছেন।

একজন প্রাক্তন সংবাদকর্মীর চোখে সংবাদ কখনও শুধু কর্মস্থল ছিল না- ছিল এক পরিবার, এক দায়িত্ববোধ, এক আত্মিক সম্পর্ক। আর সেই পরিবার আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে- এটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

বরেণ্য সাংবাদিকদের অনেকেই এখন আমাদের মাঝে নেই, ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

সংবাদ কর্তৃপক্ষেরপ্রতি অনুরোধ- এই দীর্ঘ ইতিহাস, এই সাংবাদিকদের অবদান এবং তাদের কাজ সংরক্ষণ করার জন্য একটি স্মারক গ্রন্থ বা আর্কাইভ প্রকাশ করা হোক। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সংবাদ-এ সাংবাদিকতার শিকড় সম্পর্কে জানতে পারে। কেননা ওই সব বরেণ্য সাংবাদিকদের অনেকেই এখন আর আমাদের মাঝে নেই।

সংবাদ-এর ৭৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে জানাই অভিনন্দন, প্রীতি ও অফুরাণ শুভেচ্ছা। আর কামনা করছি 'সংবাদ'-এর অনাগত সমৃদ্ধি।

লেখক: কলকাতা প্রতিনিধি, সংবাদ

শহীদুল্লাহ কায়সার ও সংবাদের লড়াইয়ের গল্প

শামীম রিজভী

বাঙালি জাতির মুক্তির ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবেজড়িয়ে আছে একটি নাম, ‘দৈনিক সংবাদ’। ৭৬ বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় এই পত্রিকাটি কেবল একটি সংবাদপত্রহিসেবে নয়, বরং স্বাধীনতারপক্ষের এক অবিনাশী কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তবে এই পথচলা কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। এই দীর্ঘ যাত্রার প্রতিটি পাতায় মিশে আছে রক্ত, আত্মত্যাগআর স্বজন হারানোর হাহাকার। বিশেষ করে একাত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে সংবাদ-এর ওপর যে আঘাত এসেছিল, তা বিশ্বের সংবাদপত্রেরইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। সেই রক্তক্ষয়ীইতিহাসের কেন্দ্রে রয়েছেন এক কিংবদন্তি সাংবাদিক ও লেখক, দৈনিক সংবাদের তৎকালীন বার্তা সম্পাদক শহীদুল্লাহকায়সার।

পুড়ে ছাই হলেও দমে যায়নি সংবাদের কণ্ঠ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানিহানাদার বাহিনী যখন ‘অপারেশন সার্চলাইট’-এর নামে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তুছিল দৈনিক সংবাদ-এর কার্যালয়। স্বাধীনতারপক্ষে শুরু থেকেই আপসহীন অবস্থানের কারণে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীও তাদের এদেশীয় দোসরদের চক্ষুশূল ছিল এই পত্রিকা।

সেই কালরাতে সংবাদ-এর বংশালস্থ কার্যালয়েআগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত হয় ছাপাখানা, নথিপত্র আর অগণিত স্বপ্ন। আগুনে পুড়ে শহীদ হন সাংবাদিক সাবের আহমেদ। পাকিস্তান সরকার ও তাদের সমর্থকরা ভেবেছিল আগুন দিয়ে সংবাদ-এর মুখ বন্ধ করে দেওয়া যাবে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি, আদর্শের যে আগুন বাঙালির হৃদয়ে সংবাদ জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তা নেভানো সম্ভব ছিল না।

শহীদুল্লাহ কায়সার: কলম যোদ্ধা থেকে অকুতোভয় শহীদ

দৈনিক সংবাদ-এর প্রাণভোমরাছিলেন বুদ্ধিজীবীশহীদুল্লাহ কায়সার। সাংবাদিকতার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যেওতিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বার্তা সম্পাদক হিসেবে তিনি সংবাদ-কে কেবল খবরের কাগজ হিসেবে নয়, বরং আন্দোলনেরহাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।২৫ মার্চের অগ্নিকাণ্ডের পর আত্মগোপনে থেকেও তিনি কলম থামাননি। অবরুদ্ধ ঢাকা থেকে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীনতার সপক্ষে কাজ করে গেছেন। পাকিস্তানিসেনাদের ওপর নজরদারি আর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল অনন্য। কিন্তু এই নীরব লড়াইয়ের খবর পৌঁছে গিয়েছিল ঘাতকদের কানে।

বিজয়ের প্রাক্কালেসেই নৃশংসতম অন্তর্ধান

নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর যখন বাংলাদেশ বিজয়ের ঠিক দ্বারপ্রান্তে, সারা দেশের মানুষ যখন মুক্তির অপেক্ষায় প্রহর গুনছে, তখনই নেমে আসে অন্ধকার। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১। পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানিহানাদার বাহিনী তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীর সহযোগিতায় মেতে ওঠে এক পৈশাচিক বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞে।

সেই তালিকায় অন্যতম প্রধান নাম ছিল শহীদুল্লাহ কায়সার। সেদিন বিকেলে রাজধানীর কায়েতটুলিরবাসা থেকে তাকে ধরে নিয়ে যায় আলবদর বাহিনীর সদস্যরা। শহীদুল্লাহকায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার পরবর্তীতে অপহরণকারীদের মধ্যে একজনকে শনাক্ত করেছিলেন, তিনি হলেন খালেক মজুমদার। পান্না কায়সারের সাক্ষ্য অনুযায়ী, শহীদুল্লাহকায়সারকে তুলে নিয়ে খালেক মজুমদার আল-বদর বাহিনীর অপারেশন ইনচার্জ চৌধুরী মুঈনুদ্দীনএবং আশরাফুজ্জামান খানের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর তুলে নেওয়ার পর শহীদুল্লাহ কায়সারেরমরদেহ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি তার ভাই জহির রায়হান তাকে খুঁজতে গিয়ে নিজেও নিখোঁজ হন। খালেক মজুমদারকে পরবর্তীতেএই হত্যার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যিনি আদালতে বলেছিলেন যে তিনি শহীদুল্লাহকায়সারকে চৌধুরী মুঈনুদ্দীন ও আশরাফুজ্জামানের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

শহীদুল্লাহ কায়সার আর ফিরে আসেননি। বিজয়ের লাল সূর্য ওঠার ঠিক আগমুহূর্তে এক মেধাবী সাংবাদিককেহারায় জাতি। তার অপরাধ ছিল তিনি সত্য বলতেন, তিনি স্বাধীনতারস্বপ্ন দেখতেন এবং তিনি সংবাদ-এর মাধ্যমে সেই স্বপ্ন মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতেন।

৭৬ বছরের অহংকার ও দায়বদ্ধতার উত্তরাধিকার

আজ দৈনিক সংবাদ যখন ৭৬ বছরে পা দিচ্ছে, তখন ফিরে তাকালে দেখা যায় এক মহাকাব্যিক লড়াইয়ের ছবি। একটি পত্রিকা কীভাবে নিজের কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়ার পরও ফিনিক্স পাখির মতো ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে উঠতে পারে, সংবাদ তার প্রমাণ। সংবাদ কেবল একটি সংখ্যা নয়, এটি সেই সব শহীদের রক্তের ঋণে গড়া এক প্রতিষ্ঠান।বর্তমানের আধুনিক সাংবাদিকতার ভিড়ে সংবাদ আজও তার সেই পুরনো তেজ ধরে রেখেছে। ৭৬ বছরের এই জয়যাত্রায়শহীদুল্লাহ কায়সারের আদর্শই পত্রিকাটিরমূল চালিকাশক্তি।

বাংলার গণমানুষেরঅধিকার আদায়ের লড়াইয়ে সংবাদ আজও অবিচল। আজ এই বিশেষ দিনে জাতি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে শহীদুল্লাহকায়সারসহ সেই সব সংবাদকর্মীকে, যারা একটি স্বাধীন মানচিত্রের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।সংবাদের এই দীর্ঘ পথচলা আগামী প্রজন্মেরসাংবাদিকদের জন্য এক বড় অনুপ্রেরণা। কারণ, সংবাদ আমাদের শেখায় কীভাবে ধ্বংসের ভেতর থেকেও সৃষ্টির উল্লাসে মেতে উঠতে হয় এবং কীভাবে রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকেঅক্ষুণ্ণ রাখতে কলম চালাতে হয়। শহীদুল্লাহকায়সারের স্বপ্ন আর দৈনিক সংবাদের আপসহীন ত্রা আজ আমাদের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

লেখক: সিনিয়র নিউজরুম এডিটর ও রিপোর্টার, সংবাদ